WAGES IN BANGLADESH

A study of Tea estates, Ready Made Garment, Leather, and Construction

Kea Tijdens, Ahmed Adib, Daniela Ceccon,
Tahreen Tahrima Chowdhury, Minhaj Mahmud,
Gabriele Medas, Paulien Osse, Maarten van Klaveren

Bengali Version

WageIndicator Foundation

www.wageindicator.org

WageIndicator Foundation is a non-profit NGO. It develops, operates and owns national WageIndicator websites in 140 countries with labour-related content, using data from its WageIndicator Salary and Working Conditions Survey, Minimum Wages Database, Collective Agreement Database, Salary Checks and Calculations, DecentWorkChecks and related Labour Law Database, and Cost of Living Survey and resulting Living Wages Database. The mission of WageIndicator is to promote labor market transparency for the benefit of all employers, employees and workers worldwide by sharing and comparing information on wages, labor law and career. WageIndicator does so by making this information freely available on easy to reach and read national websites in the national language(s), using sophisticated search engine optimization. All websites are accessible through mobile phones. For Decent Wages in Bangladesh WageIndicator coordinated the project, adapted its Wages and Cost-of-Living surveys to the Bengali situation, disposed its survey software, analysed the data and contributed to the report.

Bangladesh Institute of Development Studies
https://www.bids.org.bd/

The Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) in Dhaka is an autonomous public multi-disciplinary organization which conducts policy-oriented research on develop¬ment issues facing Bangladesh and other developing countries. The mission is to facilitate learning in development solutions by conducting credible research, fostering policy dialogue, disseminating policy options, and developing coalitions to promote informed policy making. The Institute also conducts training on research methodologies and carries out evaluation of development interventions. In that pursuit, BIDS is involved in collection and generation of socio-economic data for carrying out analytical and policy loaded research on current economic and social issues and dissemination of research findings and knowledge on developmental concerns to support policy formulation. BIDS researchers also contribute directly to formulation of government policies through their interactions and participation in the policy-making process. For Decent Wages in Bangladesh BIDS researchers contributed to the surveys, implemented fieldwork for the Wages and the Cost-of-Living surveys, CBA annotations, and the report writing.

গ্রন্থাগারিক তথ্য

Tijdens KG, Ahmed A, Ceccon D, Chowdhury TT, Mahmud M, Medas G, Osse P, Van Klaveren M (2020) Wages in Bangladesh, A study of Tea estates, Ready Made Garment, Leather, and Construction. Amsterdam, WageIndicator Foundation, December.

এই প্রতিবেদনটি অনলাইনে ইংরেজি ও বাংলায় পাওয়া যায়, দেখুন
https://wageindicator.org/Wageindicatorfoundation/projects/decent-wage-bangladesh-phase-1

এই প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট অনলাইনে পাওয়া যায়, দেখুন
বাংলাদেশে মজুরি (Wages in Bangladesh), মজুরির নমুনায়ন এবং মাঠকর্ম ও কর্মজরিপ ২০২০ এর পরিশিষ্ট/ আমস্টারডাম, ওয়েজইন্ডিকেটর ফাউন্ডেশন।
https://wageindicator.org/Wageindicatorfoundation/projects/decent-wage-bangladesh-phase-1

মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ বাংলাদেশ (Wages and Work Survey 2020 Bangladesh) সম্পর্কিত উপাত্ত ও কোডবই অনুরোধসাপেক্ষে বিনামূল্যে পাওয়া যায়: k.g.tijdens@uva.nl.

@২০২০ ওয়েজইন্ডিকেটর ফাউন্ডেশন, স্বত্ব সংরক্ষিত।

ইমেইল: ওয়েজইন্ডিকেটর ফাউন্ডেশন office@wageindicator.org

সূচিপত্র

নির্বাহী সারসংক্ষেপ **9**

১। বাংলাদেশে শোভন মজুরি প্রকল্প **13**

প্রকল্পের লক্ষ্য 13

পাঁচটি গবেষণা ও কতিপয় ওয়েবপেইজ 14

প্রতিবেদনের কাঠামো 15

আঞ্চলিক বিভাগ ও শিল্পখাত নির্বাচন 15

নমুনায়ন এবং মাঠকর্ম 16

নমুনার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ 18

২। চারটি নির্বাচিত শিল্পখাত **20**

তৈরি পোশাক শিল্প 20

চামড়া ও পাদুকা শিল্প 25

নির্মাণ শিল্প 28

চা বাগান ও এস্টেট 30

৩। আয় **32**

দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক মজুরি 32

ঘণ্টাপ্রতি ও মাসিক মজুরি 33

নিম্নতম মজুরি এবং জীবনধারণ উপযোগী মজুরি 34

বার্ষিক ভাতা/বোনাস 35

কর্মক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ 37

ওভারটাইম মজুরি 38

সময়মতো ও নগদে মজুরি প্রদান 39

বেতন বৃদ্ধি 40

বেতন নিয়ে সন্তোষ 40

৪। বাংলাদেশে জীবনধারণ উপযোগী মজুরি **42**

বিভিন্ন পরিবারের জীবনধারণ ব্যয় 44

চট্টগ্রাম অঞ্চল 44

ঢাকা অঞ্চল 46

সিলেট অঞ্চল 47

রাজশাহী অঞ্চল 48

৫। পেশা ও শিক্ষা **50**

পেশা 50

শিক্ষা 51

৬। কর্মঘণ্টা **54**

চুক্তিবদ্ধ কর্মঘন্টা 54

সাপ্তাহিক কার্যদিবস 54

সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা 55

বার্ষিক কর্মঘন্টা 56

৭। কর্মনিয়োগের বৈশিষ্ট্য **57**

চার ধরনের নিয়োগচুক্তি 57

কাজের অভিজ্ঞতার সময়কাল 58
৮। চার খাতে কোভিড-১৯ এর অভিজ্ঞতা 60
কোভিড-১৯ এর কারণে কাজে অনুপস্থিতি 60
কোভিড-১৯ এর কারণে অনুপস্থিত কার্যদিবস 61
হ্রাসকৃত মজুরি 62
কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি 63
৯। খানার গঠন কাঠামো ও আয় 66
জীবনসঙ্গী ও সন্তানদের সাথে বসবাস 66
খানার আকার বা সদস্য সংখ্যা 66
খানার আয় 67
১০। নিম্নতম মজুরি 69
নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ 69
মূল মজুরি ও ভাতাসমূহ 69
চারটি নির্বাচিত শিল্প খাতেনিম্নতম মজুরি 70
১১। যৌথ দরকষাকষি চুক্তি 72
বাংলাদেশে যৌথ দরকষাকষি 72
সংগৃহীত যৌথ দরকষাকষি চুক্তির সংখ্যা এবং প্রতিনিধিত্বশীলতা 72
যৌথ দরকষাকষি চুক্তির কোডিং এবং টীকা 73
যৌথ দরকষাকষি চুক্তির বিন্যাস এবং স্বাক্ষরকারী 74
যৌথ দরকষাকষি চুক্তির বিষয়সমূহ 75
যৌথ শ্রম চুক্তির আওতা 76
গ্রন্থপঞ্জি 78

চিত্রের সূচি

চিত্র ১: চার শ্রেণীর মজুরি সময়কালের বিভাজন, লিঙ্গ, বয়স, খাত, চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে 32
চিত্র ২: প্রযোজ্য নিম্নতম মজরি হারে বা তার অধিক হারে মজুরি পরিশোধের শতকরা হার, লিঙ্গ, বয়স, খাত, চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে 33
চিত্র ৩: প্রযোজ্য নিম্নতম মজুরি হার বা জীবনধারণ উপযোগী মজুরি বা তার চেয়ে বেশি হারে শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের শতকরা হার, লিঙ্গ, বয়স, খাত, চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে 34
চিত্র ৪: বার্ষিক ভাতা গ্রহণকারী শ্রমিকের শতকরা হার, লিঙ্গ, বয়স, খাত, চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে 35
চিত্র ৫: সামাজিক নিরাপত্তা, মজুরিসহ অসুস্থতাজনিত ছুটি ও চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণকারী শ্রমিকদের শতকরা হার, লিঙ্গ, বয়স ও খাত অনুসারে 36
চিত্র ৬: কর্মস্থল থেকে সুবিধা প্রাপ্ত শ্রমিকদের শতকরা হার, লিঙ্গ, বয়স, খাত ও চুক্তি ভেদে 37
চিত্র ৭: খাত ও অঞ্চল ভেদে ওভারটাইম মজুরির বিন্যাস 38
চিত্র ৮: ওভারটাইম মজুরি সময়মতো ও নগদে প্রাপ্ত প্রাপ্ত শ্রমিকদের শতকরা হার, লিঙ্গ, বয়স, খাত ও চুক্তি ভেদে 39
চিত্র ৯: বেতন বৃদ্ধির আবেদন ও বৃদ্ধি প্রাপ্তির বিন্যাস (লিঙ্গ, বয়স, খাত ও প্রতিষ্ঠানের আকার 40

চিত্র ১০: বেতন নিয়ে গড় সন্তোষ (১=অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, ৫= অত্যন্ত সন্তুষ্ট) 41
চিত্র ১১: চট্টগ্রামে জীবনধারণ উপযোগী মজুরি (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, নিম্নসীমার মূল্যানুমান/আনুমানিক হিসাব) 45
চিত্র ১২: ঢাকায় জীবনধারণ উপযোগী মজুরি (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, নিম্নসীমার মূল্যায়ন/আনুমানিক হিসাব) 47
চিত্র ১৩: সিলেটে জীবনধারণ উপযোগীমজুরি (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, নিম্নসীমার মূল্যায়ন/আনুমানিক হিসাব) 48
চিত্র ১৪: রাজশাহীতে জীবণধারণ উপযোগী মজুরি (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, নিম্নসীমারমূল্যায়ন/আনুমানিক হিসাব) 49
চিত্র ১৫: খাত অনুযায়ী পেশার শ্রেণী বিন্যাস 50
চিত্র ১৬: শিক্ষার স্তর ও লিঙ্গ ভেদে শ্রমিকদের শতকরা হার 52
চিত্র ১৭: চার ধরনের শিক্ষাস্তরে শ্রমিকের শতকরা হার (খাত অনুসারে) 53
চিত্র ১৮: সাপ্তাহিক কার্যদিবস, খাত ও অঞ্চল ভেদে শ্রমিকের শতকরা হার 55
চিত্র ১৯: বার্ষিক ছুটি (বেতনসহ) ভোগকারী শ্রমিকদের শতকরা হার (লিঙ্গ, বয়স, খাত, চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে) 56
চিত্র ২০: খাত ও অঞ্চল ভেদে চুক্তির বিন্যাস 57
চিত্র ২১: লিঙ্গ, বয়স, খাত ও প্রতিষ্ঠানের আকার অনুসারে চুক্তির বিন্যাস 59
চিত্র ২২: মার্চের শেষভাগ থেকে মে মাসের শেষভাগ এবং জুন থেকে সেপ্টেম্বর/অক্টোবর পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজে অনুপস্থিতি 61
চিত্র ২৩: অনুপস্থিত কর্মীদের অনুপস্থিত দিনের সংখ্যা, মাস ও খাত ভেদে 62
চিত্র ২৪: হ্রাসকৃত মজুরির সাথে মানিয়ে নেয়া 63
চিত্র ২৫: হ্রাসকৃত মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকদের শতকরা হার (যারা পরিবার ও বন্ধ-বান্ধবদের থেকে ধার নিয়েছে), লিঙ্গ, বয়স ও খানার ধরন ভেদে 63
চিত্র ২৬: পাঁচ ধরনের পরিমাপ পর্যাপ্ত সরবরাহের ঝুঁকি নিরূপণ 65
চিত্র ২৭: পাঁচ ধরনের স্বাস্থ্যসুবিধার অপ্রতুল সরবরাহজনিত ঝুঁকি যাচাই 65
চিত্র ২৮: খানার গঠন কাঠামো (বয়স গ্রুপ, লিঙ্গ ও মোট সংখ্যা ভেদে) 66
চিত্র ২৯: খানার আকারের বিভাজন (বয়স, গ্রুপ, লিঙ্গ এবং মোট সংখ্যার ভিত্তিতে) 67
চিত্র ৩০: জাতীয় পর্যায়ে নিম্নতম মজুরি, তৈরি পোশাক খাত এবং চামড়া খাতের গ্রেডভিত্তিক মজুরি (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক মোট ন্যূনতম মজুরি) 71
চিত্র ৩১: যৌথ শ্রম চুক্তির আওতাভুক্ত এবং একে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধারণাপোষণকারী শ্রমিকের শতকরা হার (লিঙ্গ, বয়স, খাত ও নিয়োগ চুক্তি ভেদে) 77

সারণীর সূচি

সারণি ১: খাত ও আঞ্চলিক বিভাগ ভেদে সাক্ষাতকারের সংখ্যা 16
সারণি ২: নারী শ্রমিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকেরদের শতকরা হার এবং গড় বয়স, খাত ও অঞ্চল ভেদে 19
সারণি ৩: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানা, আকার ও মালিকানা ভেদে 25
সারণি ৪: চামড়া ও পাদুকা শিল্প কারখানা, আকার ও মালিকানা ভেদে 27
সারণি ৫: বাংলাদেশের চা বাগান ও এস্টেট, আকার ও মালিকানার ভিত্তিতে 31
সারণি ৬: চট্টগ্রামে জীবনধারণ ব্যয় ও জীবনধারণ উপযোগী মজুরি (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০) 45

সারণি ৭: ঢাকার জন্য ব্যয় ও জীবনধারণ উপযোগী মজুরি গণনা (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০) 46
সারণি ৮: সিলেটের জন্য ব্যয় ও জীবনযাপন উপযোগী মজুরি গণনা (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০) 47
সারণি ৯: রাজশাহী অঞ্চলের জন্য ব্যয় ও জীবনযাপন উপযোগী মজুরি গণনা (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০) 49

বক্সের সূচি

বক্স ১: জীবনধারণ ব্যয় জরিপের গবেষণা পদ্ধতি 43
বক্স ২: বাংলাদেশ মজুরি ও কাজ জরিপ পদ্ধতি 50
বক্স ৩: বাংলাদেশ মজুরি ও কাজ জরিপ – গবেষণা পদ্ধতি 54
বক্স ৪: বাংলাদেশ মজুরি ও কাজ জরিপ – গবেষণা পদ্ধতি 57
বক্স ৫: কোভিড-১৯ এর কারণে কাজে অনুপস্থিত বিষয়ক প্রশ্ন 60
বক্স ৬: সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা 64
বক্স ৭: বাংলাদেশ মজুরি ও কাজ জরিপ – গবেষণা পদ্ধতি 66
বক্স ৮: নিম্নতম মজুরি – গবেষণা পদ্ধতি 70
বক্স ৯: যৌথ দরকষাকষি চুক্তি (সিবিএ) – গবেষণা পদ্ধতি 73

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে শোভন মজুরি (১ম পর্যায়) (Decent Wage Bangladesh phase 1) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্তে দেশের তিনটি অঞ্চলের চারটি কম মজুরির খাতের প্রকৃত মজুরি, জীবন নির্বাহ বা জীবনধারণ ব্যয় ও যৌথ দরকষাকষি চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান করা। এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে নেদারল্যান্ডভিত্তিক এনজিও মন্ডিয়াল এফএনভি। প্রকল্পটি মন্ডিয়ালের সামাজিক সংলাপ সংক্রান্ত থিমের জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। ডিসেন্ট ওয়েজ বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় ২০২০ সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ৫ ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে যেমন মজুরি ও কাজ বিষয়ক জরিপের মাধ্যমে ১,৮৯৪ জন শ্রমিকের মুখোমুখি বা সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, জীবনধারণ ব্যয় জরিপের আওতায় সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করে মোট ১৯,২৫২টি দাম পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং ২৭টি যৌথ দরকষাকষি চুক্তির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়। এছাড়া চারটি নির্বাচিত খাতের ওপর ডেস্ক রিসার্চ সম্পন্ন করা হয় ওয়েজেইন্ডিকেটর ফাউন্ডেশন নামক একটি এনজিও প্রকল্প কাজের সমন্বয় সাধন করে। এ এনজিওর একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে যেখানে বিশ্বের ১৪০টি দেশের কাজ ও মজুরি সংক্রান্ত তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এর যেমন রয়েছে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তেমনি রয়েছে মজুরির ধরন, জীবনধারণ ব্যয়, ন্যূনতম মজুরি ও যৌথ শ্রম বা দরকষাকষি চুক্তি বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সুনাম ও ঐতিহ্য। এই প্রকল্পে ওয়েজইন্ডিকেটরকে সহযোগিতা করেছে ঢাকাস্থ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), যার জরিপকার্য পরিচালনায় রয়েছে সুখ্যাতি ও বিশেষ পারদর্শিতা। অধিকন্তু ওয়েজইন্ডিকেটরের সাথে রয়েছে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক। ওয়েজইন্ডিকেটর বাংলাদেশের ওয়েবসাইটে প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং প্রকল্পের ওয়েবপেইজে ভিজ্যুয়াল গ্রাফিক্স ও ছবি দেয়া আছে। জীবনধারণ ব্যয় জরিপের ফলাফল এখানে দেখা যাবে।

বর্তমান প্রতিবেদনে উল্লেখিত চারটি প্রধান শিল্পখাত হলো তৈরি পোশাক, **চামড়া ও পাদুকা, নির্মাণ এবং চা বাগান ও এস্টেট**। *মজুরি ও কাজ জরিপে* ৬৫টি তৈরি পোশাক কারখানার ৭২৪ জন শ্রমিক, ৩৪টি চামড়া ও পাদুকা কারখানার ৩৩৭ জন শ্রমিক, বিভিন্ন নির্মাণ সাইটের ৪৩২ জন নির্মাণ শ্রমিক, এবং ৫টি চা বাগান ও ১৫টি চা এস্টেটের ৪০১ জন চা শ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। *মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০* পরিচালনা করা হয়েছে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেট বিভাগে।

এ গবেষণায় শ্রমিকদের মজুরি আয় বিস্তারিতভাবে পরিমাপ করা হয়েছে। দেখা গেছে, তৈরি পোশাক, চামড়া ও পাদুকা, নির্মাণ এবং চা বাগান ও এস্টেট খাতে নিয়োজিত একজন শ্রমিকের মাসিক

মিডিয়ান মজুরি যথাক্রমে ৯,৪৫৭, ১০,৮০০, ১১,৫৪৭ ও ৩,০৯২ টাকা। তবে এক্ষেত্রে নারী কর্মীদের মজুরি পুরুষদের তুলনায় ৭৭ শতাংশ কম, যা বেতনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈশ্বিক লিঙ্গবৈষম্যকে প্রতিফলিত করে। একই কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিককে আলাদা মজুরি প্রদান করা এই বৈষম্যের মূল কারণ নয়, বরং লিঙ্গীয় ভিত্তিতে বিভাজিত শ্রম বাজারে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণই এর কারণ। চা বাগান ও এস্টেটের বেশির ভাগ শ্রমিকই নারী, যারা আবার কম মজুরির কাজে নিয়োজিত। কম বয়সী শ্রমিকদের তুলনায় ৪০ ও তদূর্ধ্ব বয়সী শ্রমিকরা অনেক কম বেতন পেয়ে থাকে। এজন্য চা বাগান ও এস্টেটগুলোতে বয়স্ক নারী শ্রমিকদের ব্যাপক উপস্থিতিই অংশত দায়ী। স্থায়ী চুক্তির মাধ্যমে নিযুক্ত বা চুক্তিবিহীন নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরির চেয়ে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নিয়োগকৃত শ্রমিকদের মজুরি বেশি। প্রতি ১০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৭ জন বার্ষিক বোনাস পেয়ে থাকে বলে জানিয়েছে। প্রতি ১০ জনে প্রায় ৩ জন শ্রমিক পেনশন ফান্ডের সদস্য এবং চা এস্টেটে এই সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি, যা এই খাতের কম মজুরির ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে দেয়। বেকারত্ব তহবিল, প্রতিবন্ধী তহবিল বা চিকিৎসা বিমায় তাদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে । তবে মজুরিসহ অসুস্থতাজনিত ছুটি ও চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণের কথা শ্রমিকরা প্রায়শ উল্লেখ করেছে। সকল ধরনের তহবিল ও সুযোগ-সুবিধাদিতে পুরুষ শ্রমিকের চেয়ে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ বেশি। মজুরিসহ অসুস্থতাজনিত ছুটি বাদে অন্য সকল তহবিলে অন্য ৩টি খাতের শ্রমিকদের চেয়ে চা বাগান ও এস্টেটে কর্মরত শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বেশি। নির্মাণখাতের শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেই। "নিয়োগদাতা অ-আর্থিক সুবিধা যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান বা যাতায়াত সুবিধা প্রদান করে কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে প্রতি ১০ জনে প্রায় ২ জন শ্রমিক খাদ্য সুবিধা, ৩ জনের বেশি বাসস্থান সুবিধা, বস্ত্র সুবিধা প্রায় কেউই না, এবং ১ জনের বেশি শ্রমিক যাতায়াত সুবিধার কথা উল্লেখ করেছে। অন্য খাতগুলোর তুলনায় চা বাগান ও এস্টেটে নিয়োজিত শ্রমিকরা খাদ্য ও বাসস্থান সুবিধা প্রাপ্তির কথা বেশিবার উল্লেখ করেছে। এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিক বলেছে, তাদের অতিরিক্ত কর্মঘণ্টার পারিশ্রমিক বা মজুরি প্রিমিয়াম সহযোগে স্বাভাবিক মজুরি হারে প্রদান করা হয়, এক-তৃতীয়াংশ ওভারটাইম মজুরি স্বাভাবিক কর্মঘণ্টার মজুরি হারে প্রদান করা হয় এবং অপর এক-তৃতীয়াংশ শ্রমিকদের অতিরিক্ত কাজের জন্য পারিশ্রমিক দেয়া হয় না বলে জানিয়েছে। আর অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য মজুরি না দেয়া নির্মাণখাতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নির্মাণকর্মীরা চুক্তিবদ্ধ দীর্ঘসময় কাজ করলেও তাদের অতিরিক্ত সময়/অধিকালীন কাজ বলে তেমন কিছু নেই। এজন্য ওভারটাইম মজুরি পরিশোধ না করা নির্মাণখাতের জন্য তেমন বড় সমস্যা নয়।

জীবিকা নির্বাহ বা জীবনধারণ-উপযোগী মজুরি পরিমাপের লক্ষ্য হল শ্রমিকদের জন্য শোভন জীবনধারণের উপযোগী মজুরি স্তর নির্দেশ করা। এটি খাদ্য, বাসস্থান, যাতায়াত, স্বাস্থ্যবিধি, শিক্ষা, পানি, ফোন,পোশাক ইত্যাদি বাবদ প্রয়োজনীয় মাসিক খরচের একটি আনুমানিক হিসাব প্রদান করে। *জীবনধারণ উপযোগী ব্যয় জরিপের* মাধ্যমে ৬১ ধরনের খাদ্যসামগ্রীর দাম সহ আবাসন ও যাতায়াত

বাবদ ব্যয় সংগ্রহ করা হয়েছে অর্থাৎ মোট ১৯,২৫২ টি পণ্য ও সেবার মুল্য সংগ্রহ করা হয়। চট্টগ্রামে পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত একজন বয়স্ক শ্রমিকের পুরো পরিবারের জন্য জীবনধারণ-উপযোগী মজুরি ১৩,০০০ টাকা যা ঢাকায় ১৪,৪০০ টাকা। উভয় অঞ্চলে কম দক্ষ শ্রমিকদের সর্বনিম্ন আয়ভুক্ত স্তরের মজুরি কেবল একজন প্রাপ্তবয়স্কের জীবনধারণ ব্যয় নির্বাহের উপযোগী, মাঝারি আয়ভুক্ত স্তরের মজুরি কেবল একজন প্রাপ্তবয়স্ক এবং একটি আদর্শ (২+২) পরিবারের জন্য যথেষ্ট, এবং সর্বোচ্চ আয়ভুক্ত স্তরের মজুরি একজন প্রাপ্তবয়স্ক, একটি আদর্শ (২+২) পরিবার ও একটি সাধারণ পরিবারের জন্য যথেষ্ট। সিলেটে পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত বয়স্ক শ্রমিকের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ পরিবারের জীবনধারণ উপযোগী ব্যয় ১৬,৮০০ টাকা। সিলেটে একজন আধা-দক্ষ শ্রমিকের মজুরি একজন প্রাপ্ত বয়স্কের জীবনধারণ উপযোগী মজুরি স্তরের তুলনায় কম অর্থাৎ যথেষ্ট নয়, একটি আদর্শ ২+২ পরিবার বা একটি সাধারণ পরিবার তো দূরের কথা। উল্লেখ্য যে, এই আয়সমূহ মূলত চা বাগান ও এস্টেটের মজুরির ভিত্তিতে হিসাব করা হয়েছে এবং এসব স্থানে নিয়োগদাতা বা মালিকরা নানা ধরনের অ-আর্থিক সুবিধা যেমন খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রদান করে থাকে। তা সত্ত্বেও সিলেট অঞ্চলের মজুরি জীবনধারণ-উপযেগী মজুরি হিসেবে যথেষ্ট নয়।

নিয়োগ চুক্তি। যেখানে নির্মাণখাতের প্রায় সকল শ্রমিকের নিয়োগপত্র নেই, সেখানে চামড়াখাতে বিশেষ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বেশির ভাগ শ্রমিকের স্থায়ী নিয়োগ চুক্তিপত্র আছে। চট্টগ্রামে বেশির ভাগ তৈরি পোশাক শ্রমিকের স্থায়ী চুক্তিপত্র রয়েছে কিন্তু ঢাকায় প্রতি ১০ জনে মাত্র ৪ জন শ্রমিকের স্থায়ী চুক্তিপত্র রয়েছে। ঢাকায় তৈরি পোশাক খাতের বেশির ভাগ শ্রমিক শ্রমিক-মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছে। চট্টগ্রামের চা বাগান ও এস্টেটগুলোর অধিকাংশ শ্রমিকেরই কোনো নিয়োগ চুক্তিপত্র নেই যেখানে সিলেটে অধিকাংশ চা শ্রমিকেরই স্থায়ী নিয়োগ চুক্তিপত্র রয়েছে। শ্রমিকদের গড় চাকুরীকাল ১১ বছর। শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক বর্তমান কর্মস্থলে তাদের পদোন্নতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে।

কোভিড-১৯ সরকার দেশের সকল শিল্পকারখানায় সাধারণ ছুটি বা লকডাউনের ঘোষণা দেয়ার পর প্রথম কয়েক মাস কর্মস্থলে কর্মীদের অনুপস্থিত থাকার হার ছিল অনেক বেশি। নির্মাণখাত, তৈরি পোশাক খাত ও চামড়া খাতের প্রায় সকল শ্রমিক জানিয়েছে যে, তারা ২০২০ সালের মার্চের শেষ থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত ছিল। পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় নারী শ্রমিকরা কর্মস্থলে কম অনুপস্থিত থেকেছে। আর এর মূল কারণ হল চা বাগান ও এস্টেটগুলোর বেশির ভাগ শ্রমিকই নারী এবং সেগুলোর কার্যক্রম চলমান ছিল অর্থাৎ বন্ধ ঘোষণা করা হয়নি। কর্মস্থলে অনুপস্থিতির হার ২০২০ সালের মার্চ-মে মাসের ৭৭ শতাংশ থেকে কমে জুন-সেপ্টেম্বর মাসে ৫ শতাংশে নেমে আসে। আর সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সকল খাতে অনুপস্থিতির সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার মূল কারণ কর্মক্ষেত্র বন্ধ থাকা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে যাতায়াত সুবিধার অপ্রতুলতাও অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে কাজ করেছে। অনুপস্থিত শ্রমিকদের প্রতি ১০ জনে ৮

জনেরও বেশি শ্রমিক হ্রাসকৃত মজুরির শিকার হয়েছে। মজুরি হ্রাসের নীতি শ্রমিকদের সকল গ্রুপের উপর সমান ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। যে সকল শ্রমিক হ্রাসকৃত মজুরির শিকার হয়েছে, তাদের ৬৬ শতাংশ পরিবার বা বন্ধুদের নিকট থেকে ঋণ নিয়েছে, ২৩ শতাংশ সরকারের কাছ থেকে খাদ্য সহায়তা পেয়েছে, ২০ শতাংশ ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের (এমএফআই) নিকট থেকে ঋণ নিয়েছে, ১৪ শতাংশ অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণদাতার নিকট থেকে ঋণ নিয়েছে, ৯ শতাংশ নিয়োগকর্তার নিকট থেকে রেশন পেয়েছে এবং সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থসহায়তা গ্রহণ করেছে (৪ শতাংশ)। পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে নারী শ্রমিকরা পরিবার বা বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে প্রায়শ ধারকর্জ করেছে। এছাড়া ৪০-৪৯ বছর বয়সী শ্রমিক এবং দুইয়ের অধিক সন্তানের অধিকারী পিতামাতা বা দম্পতিদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা লক্ষ করা গেছে।

কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিধি। কর্মক্ষেত্রে ফেরার পর শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্যসম্মত সুবিধাদি সরবরাহের মূল্যায়ন করেছে। কর্মীরা আহার গ্রহণের স্থানে নিরাপদ দূরত্ব বা আসনের জায়গা ফাঁকা রেখে বসাকে (৫৬ শতাংশ একে কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দেখেছে) বহুলাংশে ইতিবাচক মনে করে। অন্যদিকে ৪৬ শতাংশ কাজের একই যন্ত্রাংশ একাধিকজন ব্যবহার না করে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করাকে ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে তারা কাজের ডেস্কের মাঝে দূরত্ব ও প্রক্ষালন কক্ষের সংখ্যা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কম ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। প্রতি ১০ জনে ২ জনের অধিক শ্রমিক প্রক্ষালন কক্ষের সংখ্যা বেশি হওয়াকে অতি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দেখেছে। অধিকাংশ শ্রমিক হাত ধোয়ার সুবিধাকে পর্যাপ্ত ও কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে মূল্যায়ন করেছে। কিন্তু গ্লাভস পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হয়নি কেননা প্রতি ১০ জনে ৭ জনের বেশি শ্রমিক গ্লাভসের সরবরাহ পর্যাপ্ত নয় বলে উল্লেখ করেছে। আর এটা হতে পারে গ্লাভসের ব্যবহার শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করার কারণে।

১। বাংলাদেশে শোভন মজুরি প্রকল্প

প্রকল্পের লক্ষ্য

বাংলাদেশে শোভন মজুরি (১ম পর্যায়) *প্রকল্পের*[১] লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের কিছু নির্বাচিত শিল্পের প্রকৃত মজুরি, জীবনধারণের ব্যয় এবং যৌথ দরকষাকষি বা যৌথ শ্রম চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য, জ্ঞান ও ধারণা প্রদান করা যাতে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ভূমিকাকে বিশেষ করে যৌথ দরকষাকষির ক্ষেত্রে আরও জোরালো করা যায়। ওয়েজইন্ডিকেটর ফাউন্ডেশনের এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে নেদারল্যান্ডসভিত্তিক এনজিও মন্ডিয়াল এফএনভি যা নেদারল্যান্ডসের এফএনভি ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের একটি অংশ। ডিসেন্ট ওয়েজ বাংলাদেশ প্রকল্পটি মন্ডিয়ালের সামাজিক সংলাপ সম্পর্কিত পরিবর্তন থিমের আওতাভুক্ত। পরিবর্তনের ৪টি উপায় বা পন্থা যথা- সক্ষমতা গঠন, তথ্য/জ্ঞান ও গবেষণা, জোট গঠন ও লবি (Lobby) এবং এডভোকেসী ও প্রচারণা চিহ্নিত করা হয়েছে ।

বাংলাদেশে শোভন মজুরি প্রথম পর্যায় প্রকল্প মজুরির ধরন, জীবনধারণ ব্যয় এবং যৌথ শ্রম চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে চায়। মন্ডিয়াল ট্রেড ইউনিয়নের বাংলাদেশি সহযোগীরা এসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছে। নিম্নতম মজুরি ও জীবন নির্বাহ বা জীবনধারণ উপযোগী মজুরি এবং মজুরির স্তর বিষয়ে জ্ঞান লাভের ফলে কর্মপরিবেশ ও মজুরি প্রদান বা পরিশোধ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানোর পাশাপাশি অ্যাকশন, কোলাবরেশন, ট্রান্সফরমেশন (এসিটি) উদ্যোগ[২] -এর মতো সমমনা অংশীজনদের (স্টেকহোল্ডারস) সাথে জোট গঠন করতে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

ওয়েজইন্ডিকেটর নেদারল্যান্ডভিত্তিক একটি এনজিও যাদের ওয়েবসাইটে ১৪০টি দেশের জাতীয় ভাষায় কাজ ও মজুরি সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশে যেমন এর বিস্তৃত নেটওয়ার্ক রয়েছে তেমনি মজুরির ধরন, জীবনধারণ ব্যয়, ন্যূনতম মজুরি ও যৌথ চুক্তি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে রয়েছে সুনাম ও সুখ্যাতি (ট্র্যাক রেকর্ড)। ওয়েজইন্ডিকেটর অনেক বছর ধরে *মজুরি ও কাজ জরিপ* (Wages and Work Survey) এবং *জীবনধারণ ব্যয় জরিপ* (Cost of Living Survey) নামক দুটি বহুভাষিক অনলাইন জরিপ পরিচালনা করছে এবং ন্যূনতম মজুরি হার ও যৌথ চুক্তির বিষয়বস্তু সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত তাদের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করে আসছে। বাংলাদেশে *মজুরি ও কাজ জরিপ* সম্পাদনের জন্য মুখোমুখি/সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। দুটি জরিপই অ্যাপের মাধ্যমে সহজলভ্য করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ওয়েজেইন্ডিকেটর বাংলাদেশ উন্নয়ন

---

১ লিংক দেখুন https://wageindicator.org/Wageindicatorfoundation/projects/decent-wage-bangladesh-phase-1

২ এসিটি হল গার্মেন্টস, টেক্সটাইল এবং পাদুকা শিল্পে কর্মরতদের মজুরি বৃদ্ধি ও কর্মপরিবেশের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে বিশ্বের ২০টি ব্রান্ড, খুচরা বিক্রেতা ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মধ্যেকার স্বাক্ষরিত একটি চুক্তি। এসিটি জীবনধারণ উপযোগী মজুরি অর্জনে বা প্রদানে এক ধরনের প্রতিশ্রুতি যা একটি কাঠামোর ব্যবস্থার ব্যবস্থা করে যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলে জীবনধারণ উপযোগী মজুরি অর্জনে দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে পারে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) –এর সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। উচ্চমানের গবেষণা ও জরিপ পরিচালনায় বিআইডিএসর সুনাম ও পারদর্শিতা রয়েছে। অধিকন্তু বিআইডিএস –এর সাথে ওয়েজইন্ডিকেটর ফাউন্ডেশনের রয়েছে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক।

এই প্রতিবেদন প্রস্তুতকালে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে আলোচনা চলছিল। প্রকল্পের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতীয় শ্রম আইন, নিম্নতম মজুরি আইন/বিধি এবং বিভিন্ন খাতের যৌথ শ্রম চুক্তির সাথে শোভন কাজের কমপ্লায়েন্সের উপর দৃষ্টিপাত করা হবে। এসব তথ্য ও ট্রেড ইউনিয়নের কৌশলসমূহের উপর ভিত্তি করে কারখানাগুলোতে মজুরি ও কাজের ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্সের উন্নতির লক্ষ্যে কিভাবে ছোট ছোট সামাজিক সংলাপ সংগঠিত বা আয়োজন করা হবে সে বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সঙ্গে নিয়ে অর্থাৎ যৌথভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

পাঁচটি গবেষণা ও কতিপয় ওয়েবপেইজ

এ প্রকল্পের আওতাধীন ৫টি গবেষণা ক্ষেত্র হলো - মজুরি বিষয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী জরিপ (মুখোমুখি), জীবনধারণ ব্যয় জরিপ, যৌথ চুক্তির ইনভেন্টরী, নিম্নতম মজুরি হারের ইনভেন্টরী এবং নির্বাচিত চারটি শিল্প খাতের ওপর ডেস্ক রিসার্চ। *জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০* -এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলোর ১৩টি নিম্ন আয়ের এলাকায় জীবনধারণ ব্যয় পরিমাপ করা এবং নির্বাচিত আঞ্চলিক বিভাগগুলোতে জীবনধারণ-উপযোগী মজুরি পরিমাপ করা। মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ এর লক্ষ্য হলো নির্বাচিত আঞ্চলিক বিভাগ ও খাতগুলোতে বাংলাদেশি শ্রমিকদের অর্জিত মজুরি এবং তাদের কর্মক্ষেত্রের অবস্থা/পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা। যৌথ *চুক্তির তথ্যভাণ্ডারের* লক্ষ্য নির্বাচিত খাত ও আঞ্চলিক বিভাগগুলোর যৌথ দরকষাকষি সম্পর্কিত স্টেট অব দি আর্ট বিষয়ে জ্ঞান ও ধারণা প্রদান করা। *ন্যূনতম মজুরি সম্পর্কিত তথ্য* সংগ্রহের উদ্দেশ্য হলো সর্বনিম্ন বা নিম্নতম মজুরি হারের সাথে জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিক কর্তৃক উল্লিখিত মজুরি হারের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা ব্যবধান আছে কিনা তা দেখা। *ডেস্ক রিসার্চের* লক্ষ্য হচ্ছে চারটি নির্বাচিত খাতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সহ তাদের কর্মসংস্থান পরিস্থিতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি তৈরি পোশাক শিল্প, চামড়া ও পাদুকা শিল্প এবং চা এস্টেটগুলোর রপ্তানি পরিস্থিতি বর্ণনা করা।

পাঁচটি ক্ষেত্রের উপর গবেষণা করা ছাড়াও ওয়েজইন্ডিকেটর তাদের বাংলাদেশ ওয়েবসাইটে গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং প্রকল্প ওয়েবসাইটে ভিজ্যুয়াল গ্রাফিক্স ও ছবি প্রদর্শনের মাধ্যমে জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। *জীবনধারণ ব্যয় জরিপের* ফলাফলের জন্য এখানে দেখুন। নিম্নতম *মজুরি ইনভেনটরির* ফলাফলের জন্য এখানে দেখুন (ইংরেজিতে এবং বাংলায়)। যৌথ *শ্রমচুক্তির* ইনভেনটরি বিষয়ক ফলাফলের জন্য এখানে দেখুন। *মজুরি ও কাজ জরিপ সম্পর্কিত* ভিজ্যুয়ালস এখানে ইংরেজিতে দেখুন এবং এখানে বাংলায় দেখুন।

প্রতিবেদনের কাঠামো

এই প্রতিবেদনে ৫টি বিষয়ের উপর পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি মূলত *ডেস্ক রিসার্চভিত্তিক* এবং এখানে নির্বাচিত চারটি খাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জরিপের তথ্য অনুসারে চারটি খাতের শ্রমিকদের আয় সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে *জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০* থেকে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে যথাক্রমে জরিপে অংশ নেয়া শ্রমিকদের পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মঘন্টা, ও কর্মে নিয়োগ চুক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ এর উপাত্ত ছাড়াও ডেস্ক গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ও সাক্ষাৎকারদাতাদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে কীভাবে কোভিড-১৯ চারটি খাতের কার্য অবস্থা/পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কে অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে । নবম অধ্যায়ে জরিপের উপাত্তের ভিত্তিতে শ্রমিকদের খানার গঠন ও আয় সম্পর্কে সংক্ষেপে এবং দশম ও একাদশ অধ্যায়ে যথাক্রমে নিম্নতম *মজুরি* ও যৌথ *শ্রম চুক্তি* সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক প্রত্যয়/ধারণার পাশাপাশি গবেষণা পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পরিশিষ্ট ১ এ মজুরি ও কাজ জরিপের মাঠকর্মের বিস্তারিত বিবরণ, পরিশিষ্ট ২ এ জরিপে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা, পরিশিষ্ট ৩ এ *জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০* এ ব্যবহৃত প্রশ্নমালা এবং সর্বশেষে পরিশিষ্ট ৪ এ সংগৃহীত যৌথ দরকষাকষি চুক্তিসমূহের একটি তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে।

আঞ্চলিক বিভাগ ও শিল্পখাত নির্বাচন

মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের পুরো শ্রমশক্তির প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংগ্রহ করা নয়, বরং কম মজুরির খাতগুলোর একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা। কারণ এই খাতগুলো নিম্নতম মজুরি হার ও জীবনধারণ-উপযোগী মজুরি স্তরের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা উদঘাটনের জন্য প্রাসঙ্গিক। যেহেতু নির্বাচিত খাতসমূহ ও আঞ্চলিক বিভাগসমূহ সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক তথ্য পাওয়া যায় না সেহেতু উপাত্তগুলোর ক্ষেত্রে কোন ভার (weighting of the data) আরোপ করা হয়নি।

বিআইডিএস ও মন্ডিয়াল এফএনভির মধ্যে নিবিড় আলাপ-আলোচনা এবং মতবিনিময়ের পর শিল্পের কার্যক্রম, অঞ্চল বা এলাকার আয়তন, রাজধানী শহর থেকে অঞ্চলটির দূরত্ব, আবহাওয়া পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে দেশের বিদ্যমান আটটি আঞ্চলিক বিভাগের মধ্যে থেকে তিনটি বিভাগকে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। আর এ তিনটি নির্বাচিত বিভাগ হল ঢাকা , চট্রগ্রাম ও সিলেট। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি বাস করে এ তিন বিভাগে। চতুর্থ আঞ্চলিক বিভাগ হিসেবে জরিপে অন্তর্ভুক্ত রাজশাহীর ক্ষেত্রে *জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০* এ অন্যান্য উৎস থেকে উপাত্ত যোগ করতে পারে ওয়েজইন্ডিকেটর।

জরিপে কম মজুরির ৪টি শিল্পখাত নির্বাচন করা হয় যেমন চট্টগ্রাম ও সিলেটের চা বাগান ও এস্টেটসমূহ, চট্টগ্রাম ও ঢাকার নির্মাণ সাইট, এবং চট্রগ্রাম ও ঢাকার তৈরি পোশাক কারখানা এবং চামড়া ও পাদুকা কারখানা। যৌথ দরকষাকষি *চুক্তির তথ্যভাণ্ডারের ক্ষেত্রেও* এই চারটি খাতকে নির্বাচন করা হয়। তবে এ চারটি খাতের মধ্যে মাত্র দু'টি খাত যথা- তৈরি পোশাক ও চামড়া খাত থেকেই যৌথ শ্রম চুক্তি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। নির্মাণখাতে যৌথ শ্রম চুক্তি না পাওয়া গেলেও চা শিল্পে পাওয়া যায়, তবে চা শিল্পের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বিআইডিএস গবেষণা দলকে চুক্তির কপি সরবরাহ করা হয়নি। তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পে খাতভিত্তিক নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা থাকলেও নির্মাণ ও চা শিল্পে জাতীয় নিম্নতম *মজুরি* ব্যতীত খাত-সুনির্দিষ্ট নিম্নতম মজুরি নেই।

সারণি ১: খাত ও আঞ্চলিক বিভাগ ভেদে সাক্ষাতকারের সংখ্যা

	চট্টগ্রাম	ঢাকা	সিলেট	মোট	*কলাম (%)*
	মোট গণসংখ্যা	মোট গণসংখ্যা	মোট গণসংখ্যা	মোট গণসংখ্যা	
চা বাগান ও এস্টেটসমূহ	৬৫	০	৩৩৬	৪০১	২১.০
তৈরি পোশাকখাত	১১৪	৬১০	০	৭২৪	৩৮.০
চামড়া ও পাদুকা খাত	৪৬	২৯১	০	৩৩৭	১৮.০
নির্মাণখাত	১৮৫	২৪৭	০	৪৩২	২৩.০
মোট	৪১০	১১৪৮	৩৩৬	১৮৯৪	১০০.০
সারি(%)	২২%	৬১%	১৮%	১০০%	

সূত্র : Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা= ১,৮৯৪)

নমুনায়ন এবং মাঠকর্ম[৩]

জরিপে নমুনা সংগ্রহে যেসব কৌশল অবলম্বন করা হয়, নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক সমিতি (এলএফএমইএবি) কাছ থেকে তাদের সদস্য কারখানার তালিকা এবং বাংলাদেশ চা বোর্ডের কাছ থেকে চা বাগান/এস্টেটগুলোর তালিকা সংগ্রহ করা হয়েছে তবে কিছু চা বাগানের অবস্থান-সম্পর্কিত তথ্য সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ইতোপূর্বে সম্পাদিত জীবনধারণ ব্যয় জরিপ থেকে সংগ্রহ করা হয়। তৈরি পোশাক খাতের কারখানাগুলোর জন্য কোনো তালিকা সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়নি কারণ বিভিন্ন এলাকার তৈরি পোশাক কারখানার ক্লাস্টারের বিষয়ে জরিপ দল পূর্ব থেকেই ভালোভাবে জ্ঞাত ছিল। চামড়া কারখানা এবং চা বাগান ও এস্টেটগুলোকে প্রতিটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত পেশার শ্রমিকদেরকে নির্মাণক্ষেত্রগুলো থেকে খুঁজে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি সাক্ষাৎকার সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রের শীর্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন বা সম্মতি নিয়ে পরিচালনা করা হয়।

[৩] নমুনায়ন পদ্ধতি এবং ফিল্ডওয়ার্কটি যে পরিশিষ্টতে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে, ওয়েজেস ইন বাংলাদেশ, স্যামপ্লিং অ্যান্ড ফিল্ডওয়ার্ক অফ দ্যা ওয়েজেস অ্যান্ড ওয়ার্ক সার্ভে ২০২০। আমস্টারডাম, ওয়েজইনডিকেটর ফাউন্ডেশন, অনলাইনে সহজলভ্য, দেখুন https://wageindicator.org/Wageindicatorfoundation/projects/decent-wage-bangladesh-phase-1.

তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এ সমীক্ষায় ৫টি চা বাগান, ১৫টি চা এস্টেট, ৩৪টি চামড়া কারখানা, এবং ৬৫টি তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট সবগুলো নির্মাণ সাইটও পরিদর্শন করা হয়। দু'টি জরিপের মাঠকর্ম ২০২০ সালের মার্চ থেকে জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে মার্চ-এপ্রিল মাসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কোভিড-১৯ মহামারীতে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হবে, এবং নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার[৪] কোভিড-১৯ ড্যাশবোর্ড অনুসারে আক্রান্তের দিক দিয়ে এশিয়ায় পঞ্চম স্থানে পৌঁছে যায় বাংলাদেশ। ফলে মাঠকর্ম স্থগিত করা হয়। এই সুযোগে মহামারী কীভাবে কর্মক্ষেত্র ও শ্রমিকদের উপর প্রভাব ফেলেছে সে সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন জরিপের প্রশ্নমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জুলাই ও আগস্ট মাসে পরীক্ষামূলক ভাবে সাক্ষাকার পরিচালনা করা হয়। *জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০* এর মাঠকর্ম ২০২০ সালের ২০শে আগস্ট থেকে ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। জরিপ শেষে জরিপ দল ঢাকায় ফিরে আসে এবং মজুরি ও কর্ম জরিপ ২০২০এর উপর বিআইডিএসে আয়োজিত ৫ দিনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। *মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০* এর মাঠকর্ম ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত পরিচালনা করা হয়। উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম প্রত্যেক দিন নিয়মিত পরিবীক্ষণ/মনিটর করা হয়।

মজুরি ও কর্ম জরিপে মোট ১,৮৯৪ জন শ্রমিকের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। *জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০* এর ক্ষেত্রে মোট ১৩২ টি জরিপ প্রশ্নমালা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা হয়। প্রতিটি সাক্ষাৎকারের সময় সাক্ষাৎদাতার কাছে জরিপের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি তাদের সম্মতিও নেয়া হয়েছে। সকল সাক্ষাদাতার নাম গোপন রাখা হয়। এজন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে নামে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

মজুরি ও কর্ম জরিপ ২০২০ এর জন্য দুটি জরিপ দল গঠন করা হয়। প্রতিটি দল ৫ জন সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী ও ১ জন সুপারভাইজারের সমন্বয়ে গঠিত এবং এই ১০ জন সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর প্রত্যেকেই ১৬০টি থেকে ১৯২টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে জরিপ দল সুরক্ষা বিধি মেনে কাজ করে এবং জরিপে অংশগ্রহণ উদ্ভুদ্ধ করতে প্রত্যেক সাক্ষাৎদাতাকে এক প্যাকেট মাস্ক বা তার সমপরিমাণ নগদ অর্থ দেয়া হয়। সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীদের জরিপ ও অ্যাপে ভালো অভিজ্ঞতা লাভ করে। জরিপকারীদেরকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় শ্রমিকদের সহযোগিতার মাত্রা যাচাই করতেও বলা হয়। প্রতি ১০ জনে প্রায় ৮ জন শ্রমিক "ভাল" বা "খুব ভালো" এবং প্রতি ১০ জনে ২ জন "মোটামুটি" সহযোগিতা করেছে। মাত্র একজন শ্রমিক "খারাপভাবে" সহযোগিতা করেছে। "কিছুটা ভালো " বা "খুব ভাল" সহযোগিতা এ উভয় ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের চেয়ে পুরুষ শ্রমিকদের সহযোগিতার মাত্রা বেশি।

[৪] দেখুন https://covid19.who.int/table, ২৭ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে অ্যাক্সেসড।

সারণি ১-এ জরিপের জন্য নির্বাচিত তিনটি আঞ্চলিক বিভাগ ও ৪টি শিল্পখাতে পরিচালিত মাঠকর্ম সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সাক্ষাৎকার (প্রায় ৬১০ জন) নেয়া হয়েছে ঢাকার তৈরি পোশাক শিল্পে। সিলেটের চা বাগান ও এস্টেটগুলো থেকে মোট ৩৩৬ জন শ্রমিকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। সবচেয়ে কম সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে চট্টগ্রামের চামড়া ও পাদুকা শিল্প খাতে (৪৬ জন)। দুইজন শ্রমিক জরিপে অংশগ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে, ১৯ জন বেতনভুক্ত নয় এবং ২৮ জন শ্রমিক নির্বাচিত বা লক্ষ্যভূত ৪টি খাতে কাজ করত না। উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই ৪৯ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ফলে মোট ১,৮৯৪ জন শ্রমিকের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত সবগুলো সারণি ১,৮৯৪ জন সাক্ষাৎদাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।।

নমুনার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

জরিপে নারী ও পুরুষ উভয়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। দেখা গেছে, জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নারী শ্রমিকের চেয়ে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা বেশি (পুরুষ ১,০৬৯ জন ও নারী ৮১৭ জন)। তবে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের মধ্যে ৮ জনের লিঙ্গ শনাক্ত করা যায়নি বিধায় তাদেরকে "অন্যান্য" শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে[৬]। সারণি ২ থেকে দেখা যাচ্ছে, সিলেটের চা বাগান ও এস্টেটগুলোতে এবং চট্টগ্রামে তৈরি পোশাক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠই নারী। অন্যদিকে যেখানে চামড়া ও পাদুকা খাতে নারীরা মোট শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ সেখানে নির্মাণখাতে নারী শ্রমিক নেই বললেই চলে। জরিপে সকল বয়স গ্রুপের শ্রমিকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। শ্রমিকদের গড় বয়স ৩০ বছর। চা শ্রমিকদের গড় বয়স ৩৩ বছর আর তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের গড় বয়স ২৬.৫ বছর। উল্লেখ্য যে, চা বাগান বা এস্টেটের কিছু শ্রমিক তাদের প্রকৃত বয়স উল্লেখ করেনি (বা জানাতে অসম্মতি প্রকাশ করেছে) বলে সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জানা যায়।

মজুরি ও কাজ জরিপের উদ্দেশ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতের শ্রমিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা। উক্ত জরিপে এ যেসকল শ্রমিক স্থায়ী-চুক্তি এবং মধ্যস্তাকারীদের মাধমে চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়েছে তাদেরকে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক আর যারা কোনো নিয়োগপত্র বা নিয়োগ চুক্তিপত্র ছাড়াই নিযুক্ত হয়েছে তাদেরকে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সারণি ২ এ দেখা যাচ্ছে যে, গড়ে ৩২ শতাংশ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক যা নির্মাণখাতে উল্লেখ্যযোগ্য হারে বেশি কিন্তু তৈরি পোশাক খাতে কম এবং চা ও চামড়াখাতে এই হার মাঝামাঝি।

---

[৬] বি:দ্র: এই প্রতিবেদনে জরিপের ফলাফল লিঙ্গ ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর তা হয়েছে কেবলমাত্র পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে কারণ যাদের লিঙ্গ "অন্যান্য" ক্যাটাগরিতে পড়েছে তাদের সংখ্যা এতই কম যে পৃথকভাবে এর উপস্থাপন কোনো অর্থ বহন করে না।

প্রতিটি কারখানা, চা বাগান, এস্টেট বা কর্মক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীদের কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশার পদবীর প্রতিফলনের চেষ্টা করা হয়। তবে নির্মাণখাতে বিভিন্ন পেশার পদবী খুঁজে বের করা সত্যিই কষ্টসাধ্য কেননা নির্মাণধীন ভবন বা সাইটের অভ্যন্তরে সম্পাদিত কাজের প্রকৃতি ও ধরন সম্পর্কে বাইরে থেকে বলা কঠিন। এই চ্যালেঞ্জটি ছিল মূলত সরকারি খাতের নির্মাণ সাইটের বৈদ্যুতিক মিস্ত্রি, টাইলস মিস্ত্রি, প্লাম্বার, রং মিস্ত্রি এবং লিফট চালক ইত্যাদি পেশার ক্ষেত্রে। বেসরকারি খাতে নিয়োজিত কর্মীদের পেশা চিহ্নিত করা তুলনামূলকভাবে সহজ।

সারণি ২: নারী শ্রমিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকেরদের শতকরা হার এবং গড় বয়স, খাত ও অঞ্চল ভেদে

	নারী শ্রমিক (%)	অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক (%)	গড় বয়স
চট্টগ্রামের চা বাগান ও এস্টেটসমূহ	৪৩.০	৫৮.০	৩৩
সিলেটের চা বাগান ও এস্টেটসমূহ	৭৩.০	২২.০	৩৮
চট্টগ্রামের তৈরি পোশাক খাত	৭৩.০	০.০	২৬
ঢাকায় তৈরি পোশাক খাত	৫৬.০	১.০	২৭
চট্টগ্রামে চামড়া খাত	২৮.০	৯.০	৩৩
ঢাকায় চামড়া খাত	৩৫.০	২০.০	২৭
চট্টগ্রামে নির্মাণ খাত	১.০	৯৯.০	২৯
ঢাকায় নির্মাণ খাত	০.০	৯৮.০	২৯
মোট	৪৩.০	৩২.০	৩০

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা=১, ৮৯৪), লিঙ্গের অনুপস্থিত তথ্য=৬, কর্মসংস্থান চুক্তি=০, বয়স=১০)

২। চারটি নির্বাচিত শিল্পখাত

তৈরি পোশাক শিল্প

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে আমদানিকারক দেশগুলোর মধ্যে মাল্টিফাইবার অ্যাগ্রিমেন্ট (এমএফএ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে তৈরি পোশাক ও বস্ত্র (টেক্সটাইল) রপ্তানি বাণিজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত দেশগুলো যেমন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং তাইওয়ানের ওপর কোটা আরোপ করা হয়। বাংলাদেশ ১৯৭০/৮০ এর দশকে এই চুক্তির সুবিধা গ্রহণ করে। এই চুক্তির ফলে "কোটা হপিং" প্রক্রিয়া শুরু হয়। বাংলাদেশে এই প্রক্রিয়ার নিদর্শন প্রথম পরিলক্ষিত হয় ১৯৭৮ সালে যখন দক্ষিণ কোরিয়ার দেয়ওয়ু কংগ্লোম্যারেট বাংলাদেশের একটি স্থানীয় তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'দেশ' -এর সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তির মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ, যন্ত্রাংশ ও কাপড় ক্রয় এবং বাজারজাতকরণকে সম্পৃক্ত করে একটি বড় আকারের কারখানা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। দেশ গামেন্টস ছেড়ে যাওয়া প্রশিক্ষিত কর্মীরাই পরবর্তীতে নিজস্ব পোশাক রপ্তানি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। ১৯৮২ সালে প্রবর্তিত নতুন শিল্প নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু রপ্তানিবান্ধব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। দেশের পল্লী অঞ্চলের বিশাল সংখ্যক নারী জনশক্তির সম্পৃক্ততা এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স (জিএসপি) কর্মসূচির সুবাদে অনুকূল বাণিজ্যিক অবস্থান সৃষ্টি হওয়ার কারণে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ২০০০ সালে বাংলাদেশ ৪,৭৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করে, যা মোট বিশ্ব রপ্তানির ২.৩ শতাংশ এবং দেশের মোট পণ্য রপ্তানির ৭৫ শতাংশ। তৈরি পোশাক উৎপাদন খাতে কর্মসংস্থান ১৯৮৫-৮৬ সালের ২০০,০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০১-০২ সালে ১.৮ মিলিয়নে উন্নীত হয় (স্টারিটজ ২০১১, ১৩৪-১৪১; আঙ্কটাডস্ট্যাট তথ্যভাণ্ডারের ভিত্তিতে লেখকবৃন্দের হিসাব)।

বর্তমান শতকের প্রথম দশকে মূলত দুর্বল অবকাঠামোর কারণে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উৎপাদনশীলতার হার ছিল খুবই কম। কিন্তু সাময়িকভাবে সেটির প্রভাব নগণ্য ছিল শ্রম ব্যয় অত্যাধিক কম হওয়ার কারণে – ২০০৮ এ যা ছিল বিশ্বে সর্বনিম্ন (বেরিক এবং ভ্যান ডের মিউলেন রজার্স ২০১০, ৬১)। তবে আন্তর্জাতিক বাজারের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে ২০০০ সালের পরে বাংলাদেশে একক প্রতি উৎপাদন খরচ আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে এ বোধ তৈরি হয় যে, পণ্যের মান, প্রশিক্ষণ এবং উন্নত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রতি নজর দিতে হবে (স্টারিটজ ২০১১, ১৪৮; ম্যাককিন্সেয় ২০১১)। তবে রানা প্লাজা দুর্ঘটনার কারণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ তরান্বিত হয়। ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল রাজধানী ঢাকার সন্নিকটে অবস্থিত শিল্প এলাকা সাভারে রানা প্লাজা নামের নয়তলা একটি ভবন (এখানে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের কারখানা ছিল) ধসে পরে এবং এতে ১,১৩৪ জন পোশাক কর্মী নিহত হয় ও ২,০০০ এর বেশি কর্মী আহত হয়। এই দুর্ঘটনা তৈরি

পোশাক খাতের কর্মক্ষেত্রের ভয়াবহ কর্মপরিবেশ ও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুসরণে চরম অবহেলার বিষয়টি বিশ্বের সামনে উন্মোচিত করে (সিএফ. থেউস প্রমুখ ২০১৩)।

রানা প্লাজা ঘটনার কারণে প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক মহলের আস্থা কমে যায়। আন্তর্জাতিক ক্রেতারা বিশেষ করে যাদের পণ্য ধসে পরা ভবনটিতে উৎপাদিত হত যথা ইনডিটেক্স (ম্যাঙ্গ), প্রাইমার্ক, ওয়ালমার্ট ও বেনেটন নিজ নিজ দেশে জনমতের প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হয়। ২০১৩ সালের মধ্যেই আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং বিশ্বব্যাপী ইউনিয়ন সমূহ ইন্ডাস্ট্রিঅল ও ইউনি গ্লোবাল সহ ইউরোপীয় ক্রেতারা বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের ভবনের অগ্নি নির্বাপণ এবং শ্রমিকদের নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে তৈরি পোশাক ক্রেতাদের জোট অ্যাকর্ড গঠন করে, যেটি অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটির সাথে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে একমাত্র আইনানুগ বহুপাক্ষিক বা বহুঅংশীজনভিত্তিক চুক্তি। তৈরি পোশাক শিল্প খাতের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আইএলওর উদ্যোগের অংশ হিসেবে ২০১৪ সালে বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ (বিডব্লিউবি) এর যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ সরকার একটি জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা (বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের অগ্নি নিরাপত্তা ও কাঠামোগত সংস্কার বিষয়ক, এনটিপিএ) গ্রহণ করে।

রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূল্যবান অবদান রাখছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক জুড়ে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়। ২০১৯ সালে বিশ্ব তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবদান ছিল ৬.২ শতাংশ (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ)। বাংলাদেশের উপরে ছিল কেবল চীন (৩৩.১ শতাংশ)। বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির তিন পঞ্চমাংশ ইইউ-২৮ এ অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৮টি দেশে রপ্তানি হয় , যা অন্য যেকোনো একক এশীয় দেশের রপ্তানি অনুপাতের চেয়ে অনেক বেশি। আর এক্ষেত্রে সহায়তা করেছে ইইউ এর জিএসপি/এভ্রিথিং বাট আর্মস (ইবিএ) কর্মসূচি যা আবার বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিকে চীনা প্রতিযোগিতার হাত থেকে কিছুটা সুরক্ষা দেয় (আঙ্কটাডস্ট্যাট তথ্যভাণ্ডারের ভিত্তিতে লেখকবৃন্দের হিসাব; ভ্যান ক্ল্যাভারেন ও টাইডেন্স ২০১৮: ১১)। পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে। ২০১৯ সালে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে আয় হয় ৩২,৪৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮৪ শতাংশ – আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে একটি একক খাতের জন্যে এই হার অত্যন্ত বেশি।

উল্লেখ্য যে, ২০১৯ সালে তৈরি পোশাক উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রধান কাঁচামাল[৭] *টেক্সটাইল আমদানিতে* ব্যয় হয় ১০,১৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা মোট তৈরি পোশাক রপ্তানি আয়ের ৩৩ শতাংশ। এ ব্যয়ের কারণে দেশের রপ্তানি সুবিধার একটি দিক হারিয়ে যায়।

তৈরি পোশাক রপ্তানি বাদে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র পরিসরে টেক্সটাইল সামগ্রীও উৎপাদন ও রপ্তানি করে। ২০১৯ সালে টেক্সটাইল রপ্তানি থেকে আয় হয় মোট ১,৭৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিশ্ব রপ্তানির ০.৬ শতাংশ। টেক্সটাইল সামগ্রী রপ্তানিকারী দেশগুলোর মধ্যে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪তম (আঙ্কটাডস্ট্যাট তথ্যভাণ্ডার)।

বিভিন্ন সুত্রের উপর ভিত্তি করে ২০২০ সালে তৈরি পোশাক খাতে ৪.৩ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে বলে হিসাব করা হয়েছে, যা ২০১৫ সাল থেকে স্থিতিশীল রয়েছে। এই খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির প্রায় ৮০ শতাংশ (৩.৫ মিলিয়ন) নারী (সিএফ. ভ্যান ক্ল্যাভারেন ২০১৬, ১৩)। এই শিল্প খাতের আওতায় প্রায় ২,৫০০ সরবরাহকারীর[৮] মালিকানাধীন প্রায় ৫,৫০০ টি কারখানা রয়েছে। এসব কারখানাকে ৩টি শ্রেণী বা টায়ারে ভাগ করা যায়। প্রথম টায়ারের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রায় ২৫০টি কারখানা যারা সরাসরি আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে পণ্য সরবরাহ করে এবং এই কারখানাগুলো দেশের ৮টি রপ্তানি

---

৭ বিশ্বে উৎপাদিত টেক্সটাইলের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহৃত হয় তৈরি পোশাকের কাঁচামাল হিসেবে; আমরা ধরে নিচ্ছি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ খুব একটা ভিন্ন হবে না। বাংলাদেশি টেক্সটাইলের ,যা এর মোট রপ্তানির অর্ধেকেরও বেশি, বিশেষত্ব হলো হোম টেক্সটাইল উৎপাদন (বিছানার চাঁদর, পর্দা, টেবিল কভার, স্নানের কাপড় প্রভৃতি। - বাসক ২০১৮)।

৮ *ম্যাপড ইন বাংলাদেশ* (https://map.rmg.org.bd/) এ ২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩,২১২টি কারখানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১৮ সালে আমাদের রিপোর্টের জন্যে তৈরি ডাটাবেজের সাথে মিলিয়ে দেখা যায় যে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে একই মালিকানাধীন একাধিক কারখানাকে *ম্যাপড ইন বাংলাদেশ* "সম্ভবত একটি কারখানা (ফ্যাসিলিটি)" হিসেবে নথিবদ্ধ করেছে।

প্রক্রিয়াকরণ (ইপিজেড)[৯] অঞ্চলে অবস্থিত। ২০১৭/১৮ সালে ২৪টি বড় তৈরি পোশাক ও জুতা বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বা ব্র্যান্ডের দেয়া তথ্যের সহায়তায় ৫৭৯ টি বাংলাদেশি কারখানা চিহ্নিত করা হয় যারা আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে সরাসরি পণ্য সরবরাহ করে (ভ্যান ক্ল্যাভারেন এবং টাইডেন্স ২০১৮)। আমাদের দৃষ্টিতে ইপিজেড-এর বাহিরে অবস্থিত এই বাকী ৩৩০টি কারখানাও প্রথম টায়ারের অন্তর্ভুক্ত কেননা এসব কারখানার মালিকদের সাথে বিদেশী ক্রেতাদের সরাসরি সম্পর্ক আছে। ক্ল্যান এবং উইকটারিচ এই ৩৩০ টি কারখানাকে মোট ১,৯০০টি কারখানার সাথে দ্বিতীয় টায়ারের অন্তর্ভুক্ত করে, এবং যাদের সাথে বিদেশী ক্রেতার সরাসরি সম্পর্ক নেই এবং যারা সাবকন্ট্র্যাক্টের মাধ্যমে কাজ করে এমন ৩,৪০০টি কারখানাকে তৃতীয় টায়ারভুক্ত করে । তাদের মতে এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় টায়ারভুক্ত কারখানার বৈশিষ্ট্য হলো, "বেশিরভাগ কারখানার মালিকই ব্যবসা পরিচালনা করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মনোভাব নিয়ে, বিভিন্ন মাধ্যমে বাজারের চাহিদার সাথে উৎপাদন সামঞ্জস্য করে, যেমন অন্য কারখানা অথবা সোয়েট শপ সদৃশ সংস্থাতে সাবকন্ট্র্যাক্টিং বা আউটসোর্সিং করে" (ক্ল্যান এবং উইকটারিচ ২০১৫: ৮)।

২০১৭/১৮ সালে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের কাছে সরাসরি পণ্য সরবরাহকারী যে ৫৭৯টি তৈরি পোশাক ও জুতা তৈরির কারখানা চিহ্নিত করা হয় সেগুলোর উপর দৃষ্টিপাত করা যুক্তিযুক্ত। এই কারখানাগুলোর ৮২ শতাংশ ঢাকায় এবং ১৩ শতাংশ চট্টগ্রামে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক তুলনার ভিত্তিতে এসব কারখানার এক বড় অংশ (৩৮ শতাংশ) একাধিক আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডকে পণ্য সরবরাহ করে। এক বড় সংখ্যক (৭২ শতাংশ) কারখানা বৃহদাকার অর্থাৎ প্রতিটিতে ১,০০০ –এর অধিক কর্মী নিয়োজিত আছে। এমনকি

[৯] বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯ অনুসারে, ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকদের শ্রমিক কল্যাণ সমিতি (ডব্লিউডব্লিউএ) গঠনের অধিকার আছে। এই সমিতির মাধ্যমে তারা মালিকপক্ষের সাথে চাকুরির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করতে পারবে।

৭ শতাংশ (৩৯টি) কারখানায় , ৫,০০০ এর বেশি কর্মী নিয়োজিত। এই কারখানাগুলোর ৭৯ শতাংশ দেশীয় মালিকানাধীন, ২০ শতাংশ বিদেশী মালিকানাধীন এবং ১ শতাংশ যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত অর্থাৎ যৌথ মালিকানাধীন। বিদেশী মালিকানাধীন কারখানাগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই হংকং ভিত্তিক (৩৪টি কারখানা), তারপরেই রয়েছে ভারত (২৫টি) ও দক্ষিণ কোরিয়া (১৬টি) ভিত্তিক কারখানা। লক্ষণীয় যে, বৃহদাকার শ্রেণীভুক্ত ৩৯টি কারখানার মধ্যে মাত্র ৯টি (২৩ শতাংশ) কারখানা বিদেশী মালিকানাধীন (ভ্যান ক্ল্যাভারেন এবং টাইডেন্স ২০১৮: ২২, ২৩, ২৮, ৪৪)।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অবস্থা বেশ উদ্বেগজনক। কারখানাগুলোতে ট্রেড ইউনিয়নের ডেনসিটির দিকে তাকালে তা সহজেই বোঝা যায়। ২০১৯ সালে পোশাক শিল্পের ৩,৫০০ টি ট্রেড ইউনিয়নের মোট সদস্য ছিল প্রায় ১,২৩,০০০ জন অর্থাৎ শ্রমশক্তির ৩ শতাংশেরর এর চেয়েও কম শ্রমিক সমিতির সদস্য। দেশের সব কারখানারমাত্র ৪ শতাংশে ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে এ বিষয়ক পূর্ব তথ্যটির সাথে এই তথ্যটির মিল দেখতে পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর মোট সদস্যের ১৫ শতাংশ অর্থাৎ ১৯-২০,০০০ জন নারী সদস্য, যা নির্দেশ করে ২০১৯ সালে পোশাক খাতের নারী শ্রমিকদের মাত্র ০.৬ শতাংশ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ছিল (ডিটিডিএ ২০২০, ৬)। দেশের তৈরি পোশাক শিল্পে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। যেমন, ২০১৮ সালে আইএলও এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বার্তায় এই বিষয়ে কঠোর মন্তব্য দেখতে পাওয়া যায়: "রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর থেকে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১০৯টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এর মাঝে কমপক্ষে ৩৫টি দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় টেক্সটাইল কারখানাতে। এসব দুর্ঘটনায় ৪৯১ জন কর্মী আহত হয় এবং ২৭ জন প্রাণ হারায়। সক্রিয় ও কার্যকর শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা এবং যথাযথ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা না থাকায় তৈরি পোশাক শিল্পের বেশির ভাগ কর্মী ও তাদের পরিবারের জন্য মানসম্মত কাজের পরিবেশ এবং সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান এখনও অলীক কল্পনার বিষয়।" এ ধরনের মূল্যায়ন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে যদি উন্নত দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ভোক্তা এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সামাজিক এজেন্ডা বিষয়ে করপোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) (পুনরায়) বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস সঙ্কট কিছু দিনের জন্যে ভোক্তা সচেতনতার পাশাপাশি সিএসআর বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে জেনে রাখা ভালো যে, এই মহামারী বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উপর মারাত্বক আঘাত হেনেছে। মহামারীর প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ২০২০ সালের মার্চের শেষের দিকে তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকদের ওপর পরিচালিত এক অনলাইন জরিপ হতে জানা যায় যে, অর্ধেকেরও বেশি কারখানার প্রক্রিয়াধীন রপ্তানি অথবা উৎপাদন হয়ে যাওয়া পণ্যের অর্ডার বাতিল হয়ে যায়; এই বাতিল হওয়া অর্ডারের ক্ষেত্রে ৭২ শতাংশ ক্রেতা উৎপাদনকারী কারখানাকে উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত কাঁচামালের মূল্য পরিশোধে এবং ৯১ শতাংশ ক্রেতা

উৎপাদন খরচের অর্থ পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। এই সময়ে এই অর্ডার বাতিলের ফলে ১০ লাখের বেশি তৈরি পোশাক কর্মী চাকরি হারায় অথবা সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয় (অ্যান্নার ২০২০)। বাংলাদেশী সূত্র হতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকের চেয়ে দ্বিতীয় প্রান্তিকে তৈরি পোশাক খাত থেকে রপ্তানি আয় ৪৫ শতাংশ কমে যায় অর্থাৎ রপ্তানি আয় ৬,৩০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে কমে ৩,৫৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায় (ওয়েবসাইট বাংলাদেশ ব্যাংক, কমোডিটি-ওয়াইস এক্সপোর্ট রিসিপ্টস[১০])।

ম্যাপড ইন বাংলাদেশ এর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তথ্যে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মোট ৩,২১২টি তৈরি পোশাক কারখানা রয়েছে[১১]। এই কারখানাগুলোতে নিয়োজিত কর্মীর ৫৮.৫ শতাংশই নারী। অন্যদিকে মজুরি ও কাজ জরিপের আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের ৬৫টি কারখানার ৭২৪ জন তৈরি পোশাক কর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। আবার জরিপে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের মধ্যে ৫৯ শতাংশ ছিল নারী কর্মী যা *ম্যাপড ইন বাংলাদেশ* হতে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সারণি ৩ হতে দেখা যায়, এই কারখানাগুলোর মধ্যে ছয়টিতে ১০০ এর কম, ২৪টিতে ১০০-৫০০ জন, ৯টি তে ৫০০-১,০০০ জন এবং বাকী বৃহদাকারের কারখানাগুলিতে ১,০০০ এর অধিক শ্রমিক কর্মরত। জরিপকৃত এই ৬৫টি কারখানার সবকয়টিই ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে ৪৫টি একক ব্যক্তি মালিকানাধীন ও ২০টি যৌথ ব্যক্তি মালিকানাধীন।

সারণি ৩ : বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানা, আকার ও মালিকানা ভেদে

কারখানার আকার	১০-১০০	১০০-৫০০	৫০০-১০০০	>১০০০
কারখানার সংখ্যা	৬	২৪	৯	২৬
মালিকানা	ব্যক্তিমালিকানাধীন (একক)	ব্যক্তিমালিকানাধীন (যৌথ)	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	
কারখানার সংখ্যা	৪৫	২০	০	

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 *(মোট গণসংখ্যা= ১, ৮৯৪ কারখানা প্রদত্ত)*

চামড়া ও পাদুকা শিল্প

বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের আকার এখনো অনেক ছোট। নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে, ২০১৫ সালে জুতা অর্থাৎ পাদুকা তৈরির কারখানা সহ এই শিল্পে প্রায় ৮০,০০০ মানুষ নিয়োজিত ছিল (ভ্যান ক্ল্যাভারেন এবং টাইডেন্স ২০১৮, সারণি ৫)। এ খাতের অন্তর্ভুক্ত দুটি উপখাত হলো: চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন (এর মধ্যে আবার পাদুকা শিল্পও অন্তর্ভুক্ত)। ২০১৫ সালে দেশের পাদুকা শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ছিল আনুমানিক ৫০,০০০ এবং আরও ১০,০০০ কর্মী জড়িত ছিল অন্যান্য

[১০] ইপিজেড-সম্পর্কিত বাণিজ্য বাদে।

[১১] https://map.rmg.org.bd/accessed 24 Nov 2020 দেখুন। ওপেন এ্যাপারেল রেজিস্ট্রি -এর পোশাক কারখানা ম্যাপে কারখানার সংখ্যা ৫,০০০ এর অধিক দেখানো হয়েছে।

চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনে। অধিকন্তু প্রায় ১৫,০০০ (মূলত পুরুষ) কর্মী চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত ছিল (এসওএমও/সিবিএসজি ২০১৫)।

২০১৫ সালে দেশে উৎপাদিত চামড়াজাত পণ্যসামগ্রীতে ব্যবহৃত কাঁচামালের ৯০ শতাংশই ছিল দেশীয় কাঁচামাল এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত চামড়ার ১০ শতাংশ ছিল আমদানিকৃত (এসওএমও/সিবিএসজি ২০১৫)। ধারণা করা হয় যে, ২০১৯ সালে এসে এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯৫ ও ৫ শতাংশ। একই ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, সম্প্রতি দেশে প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়ার ৪০ শতাংশ রপ্তানি করা হয় এবং বাকি ৬০ শতাংশ পাদুকা এবং চামড়াজাত সামগ্রীর অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় (লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (এলএসবিপিসি) এবং আঙ্কটাডস্ট্যাট তথ্যভাণ্ডারের ভিত্তিতে লেখকবৃন্দের হিসাব।

২০০৫ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্ব চামড়া রপ্তানিতে বাংলাদেশের হিস্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু পরবর্তীতে স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছে। ২০১৯ সালে তা ছিল মোট বিশ্বরপ্তানির ১.৩ শতাংশ।

বিশ্ববাজারে পাদুকা রপ্তানিক্ষেত্রে একই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তবে রপ্তানির অংশ অনেক কম, যা ০.৬ শতাংশে স্থির রয়েছে। ২০১৫-২০১৯ সময়কালে বিশ্ব রপ্তানিতে বাংলাদেশের চামড়া ও পাদুকা শিল্পের হিস্যা ছিল ০.৭ শতাংশ যা ২ আর্থিক মূল্যে ১,১০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (জুতা/পাদুকার বাজার তুলনামুলকভাবে বড়, এর রপ্তানির পরিমাণ চামড়ার বাজারের আট গুণ)।

সার্বিকভাবে এই রপ্তানির প্রায় ৫০ শতাংশের গন্তব্য স্থান ইইউ-২৮ অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৮টি দেশ। এ রপ্তানিতে আবার চামড়ার হিস্যা ২৫ শতাংশ ও পাদুকার ৫৬ শতাংশ দেশের রপ্তানিকৃত চামড়ার ৩৮ শতাংশ এবং পাদুকার মাত্র ৩ শতাংশ রপ্তানি হয় চীন/হংকংয়ে। এই দুটি স্থান বাদে অন্যান্য দেশে রপ্তানি অনেক কম (জাপান: চামড়া ৬ শতাংশ, পাদুকা ১০ শতাংশ; যুক্তরাষ্ট্র: চামড়া ০ শতাংশ, পাদুকা ১৩ শতাংশ; দক্ষিণ কোরিয়া: চামড়া ১২ শতাংশ, পাদুকা ১.৫ শতাংশ - আঙ্কটাডস্ট্যাট ডাটাবেজ থেকে উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে)। দেশে চামড়া উৎপাদন এবং রপ্তানিতে যে

স্থবির অবস্থা বিরাজ করছে তা বাংলাদেশ সরকারের চামড়া শিল্প প্রসার ও উন্নয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং দেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থাৎ বিসদৃশ (উইকিপিডিয়া বাংলাদেশের চামড়া শিল্প)।

এই স্থবিরতার পেছনে একটি প্রধান কারণ হল চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ ব্যবস্থা ট্যানারীগুলোর করুণ অবস্থা। এ রকম অবস্থাতেই এই শিল্পের কার্যক্রম বছরের পর বছর চলে আসছে। বর্তমান শতকের প্রথম দশকের গোড়ার দিকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের পরিবেশ বিষয়ে নানা অভিযোগ আসতে থাকে যেমন শিশুশ্রমের ব্যবহার এবং ঢাকা শহরের অত্যন্ত দরিদ্র ও জনবহুল এলাকা হাজারীবাগে অবস্থিত প্রায় ২০০টি (দেশের মোট ট্যানারীর ৯৫ শতাংশ) ট্যানারির সৃষ্ট মাত্রাতিরিক্ত দূষণ। অথচ দুই দশক আগে এসব ট্যানারির কার্যক্রম বন্ধ করে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেয়া হয় তবে এ আদেশের কার্যকর বাস্তবায়ন এখনো হয়নি। এমনকি ২০১৭ সালে দেশের উচ্চ আদালতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এসব ট্যানারিতে গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয় (মেন্ডোজা এবং আলম ২০১৭)।

সারণি ৪: চামড়া ও পাদুকা শিল্প কারখানা, আকার ও মালিকানা ভেদে

কারখানার আকার	১০-১০০	১০০-৫০০	৫০০-১০০০,	>১০০০
কারখানার সংখ্যা	৬	১৯	৪	৫
মালিকানা	ব্যক্তি মালিকানাধীন (একক)	ব্যক্তি মালিকানাধীন (যৌথ)	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	
কারখানার সংখ্যা	২০	১০	৪	

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা= ১, ৮৯৪,কারখানা প্রদত্ত)

অবশেষে ২০১৮ সালে হাজারীবাগ থেকে ১০ কি:মি: উত্তরে এবং ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে ৩০ কি:মি: দূরে সাভারে স্থাপিত দেশের অত্যাধুনিক ও সর্ববৃহৎ চামড়া শিল্প নগরীতে ১৫৫টি ট্যানারি স্থানান্তরিত হয় তবে ৪০টির মতো কারখানার সাভারে স্থানান্তরের সামর্থ্য না থাকায় সেসব কারখানা তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় (আক্তার এবং আল মাহফুজ ২০১৮)। আরও উল্লেখ্য যে, সাভার শিল্প এলাকার শিল্পবর্জ্য মিশ্রিত পানি পরিশোধন এবং পুনঃব্যবহার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে আগস্ট ২০১৯ -এ স্থাপিত কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি), এখনো পর্যন্ত অপারেশনাল বা চালু হয়নি। এজন্য আগের মতো এখানেও ট্যানারিগুলো তাদের সকল অপরিশোধিত বর্জ্য নিকটবর্তী নদীতে ফেলছে। যার ফলে গ্লোবাল কমপ্লায়েন্স অডিট সংস্থা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (এলডব্লিউজি) যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশকে নীতিমালা ভঙ্গের কারণে প্রত্যায়িত না করছে ততদিন পর্যন্ত দেশের রপ্তানিকারকদেরকে তাদের উৎপাদিত পণ্য আন্তর্জাতিক মূল্যের ৩০% কমে বিক্রয় করতে হবে (মৃধা এবং আকাশ ২০১৯)।

তৈরি পোশাক খাতের মতো চামড়া ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য পণ্য উৎপাদনও করোনা ভাইরাস দুর্যোগের কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চামড়া ও 'চামড়াজাত পণ্য' (প্রধানত জুতা/পাদুকা) থেকে দেশের রপ্তানি আয় ২০২০ সালের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় ২০২০ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে প্রায় ৪০ শতাংশ হ্রাস পায় অর্থাৎ ১৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে কমে ৮০ মিলিয়নে নেমে আসে। শতকরা

হিসাবে যা তৈরি পোশাক খাতে যে পরিমাণ রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে তার চেয়ে সামান্য কম (বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট, কমোডিটি-ওয়াইস এক্সপোর্ট রিসিপ্টস[১২]).

মজুরি ও কাজ জরিপে অন্তর্ভুক্ত চামড়া এবং জুতা/পাদুকার কারখানাগুলো মূলত দেশের দুটি বিভাগ চট্টগ্রাম ও ঢাকায় অবস্থিত। চামড়া ও পাদুকা খাতের ৩৪টি কারখানার মোট ৩৩৭ জন কর্মীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, প্রতি কারখানা থেকে সর্বোচ্চ ১৯ জন। সারণি ৪ থেকে দেখা যায়, এই ৩৪টি কারখানার মধ্যে ছয়টি কারখানায় ১০০ জনের কম, ১৯টিতে ১০০-৫০০ জন, ৪টি তে ৫০০-১,০০০ জন এবং বাকী ৫টি বৃহদাকার কারখানায় ১,০০০ এর অধিক কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। এই ৩৪টি কারখানার প্রত্যেকটিই ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং মালিকানা স্বত্বের দিক দিয়ে ২০টি একক মালিকানা কারখানা, ১০টি যৌথ মালিকানা কারখানা এবং ৪টি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।

নির্মাণ শিল্প

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মহাসড়ক, রেলওয়ে, বন্দর, বিদ্যুৎ উৎপাদন, টেলিযোগাযোগ, জল উপযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশাল আকারের অবকাঠামো মূলক উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের কারণে বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে কর্মসংস্থানও। দেখা গেছে, ২০১৫ সালে যেখানে নির্মাণ শিল্পে আনুমানিক ৩.৫ মিলিয়ন মানুষ নিয়োজিত ছিল, করোনা ভাইরাস দুর্যোগ শুরুর আগে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৪ মিলিয়নে পৌঁছে। এই শ্রমিকদের মাত্র এক-দশমাংশ বা তার চেয়েও কম সংখ্যক নিয়মিত শ্রমিক অর্থাৎ তারা স্থায়ী নিয়োগ চুক্তির মাধ্যমে নিয়োজিত। বাকী বৃহৎসংখ্যক শ্রমিক অনিয়মিত দিনমজুর অর্থাৎ তারা কোনো ধরনের নিয়োগ চুক্তিপত্র ছাড়াই নিয়োজিত হয়েছে। এবং তাদের বেশির ভাগই মধ্যস্থতাকারী বা ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজে নিয়োজিত হয়েছে (মামিন প্রমুখ ২০১৯)। এ খাতে

[১২] ইপিজেড-সম্পর্কিত বাণিজ্য বাদে

সাবকন্ট্র্যাক্টিং এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে বিশেষ করে 'ডিপ' সাবকন্ট্র্যাক্টিং চেইন ব্যবহারের মাধ্যমে; এ চেইনে সবার উপরে অর্থাৎ প্রথম স্তরে রয়েছে বেশ কিছু বিদেশী সংস্থা। (ওয়েবসাইট রিসার্চ অ্যান্ড মার্কেটস)। উল্লেখ্য যে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) ৫৬ শতাংশ হ্রাস পায় (আঙ্কটাড ২০২০)। এখানে যে বিষয়টি ভূমিকা রাখতে পারে তা হল নগরায়ণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও দেশের আবাসন বাজার আশানুরূপ সম্প্রসারিত না হওয়া এবং আবাসনের উচ্চমূল্যের কারণে আবাসন বাজারে স্যাচুয়েরেশনের লক্ষণ দেখা দেয়া (দ্যা ডেইলি স্টার ২০১৯)।

এই প্রতিবেদনে ইতোপূর্বে মজুরি এবং কাজের সময় সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তবে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য পেশাগত সুরক্ষা এবং সুস্বাস্থ্যও (ওএসএইচ) গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বে সবচেয়ে বিপজ্জনক পেশাগুলির মধ্যে নির্মাণ শিল্পের কাজকে অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হিসেবে মনে করা হয়। দু:খজনক হলেও বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। ২০১৯ সালে কর্মক্ষেত্রে সংঘটিত দুর্ঘটনায় ১৩৪ জন নির্মাণ শ্রমিক প্রাণ হারায় বলে জানা যায় (২০১৮: ১৬১; ২০১৭: ১৩১)। কর্মস্থলে শ্রমিকদের আহত হওয়ার হারের দিক দিয়ে পরিবহন শিল্পের পরেই এ শিল্পের অবস্থান (দ্বিতীয় সর্বোচ্চ)। নির্মাণ শিল্পে শ্রমিক মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে দেখানোর প্রবণতা রয়েছে। বিগত ১৫ বছরে এই শিল্পে কর্মক্ষেত্রে দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় অতি উঁচুস্থান থেকে লাফ দেয়া বা নিচে পড়ে যাওয়া এবং বিদ্যুতায়িত হওয়া। বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সাময়িকী থেকে জানা যায় এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশের প্রধান কারণ হিসেবে একদিকে যেমন রয়েছে কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতনতার অভাব ও শ্রমিকদের দুর্বল দরকষাকষি ক্ষমতা অন্যদিকে তেমনি রয়েছে ঝুঁকি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অভাব এবং মালিক, প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের মধ্যে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ না করার প্রবণতা (যদি নীতিমালা থেকে থাকে) (বিলস ২০১৮, ২০১৯; মামিন প্রমুখ ২০১৯; বিডিনিউজ২৪ ২০১৭; দ্য ডেইলি স্টার ২০১৭)। রানা প্লাজা বিপর্যয় দেশে ভবন নির্মাণ নীতিমালার অভাব এবং নীতিমালা প্রয়োগে শিথিলতা ও নিষিক্রয়তার সাক্ষ্য বহন করে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার সাত বছর পরও বিদ্যমান আইনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফাঁক-ফোকর রয়ে গেছে। যদিও বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধনী) এ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা উন্নয়ন সম্পর্কিত বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত আছে তবে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত ওএসএইচ নীতি সম্পর্কিত প্রধান আন্তর্জাতিক শ্রম স্ট্যান্ডার্ডসমূহ যেমন আইএলও কনভেনশন নং ১৫৫ ও ১৮৭ -অনুসমর্থন করেনি (আইএলও ওয়েবসাইট)।

মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ এর ক্ষেত্রে নির্মাণ ক্ষেত্রগুলিতে গিয়ে প্রতিষ্ঠান শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি কারণ সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীরা সরেজমিন নির্মাণক্ষেত্র পরিদর্শন করে। একটি নির্মাণক্ষেত্রে সাধারণত যুগপৎ একের অধিক প্রতিষ্ঠান কাজ করে। নির্মাণ খাতে সর্বমোট ৪৩২ জন শ্রমিকের উপর জরিপ করা হয়।

চা বাগান ও এস্টেট

বাংলাদেশে উৎপাদিত চা মূলত বহুলাংশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে। বছরে দেশে মোট ৬৪,০০০ টন চা উৎপাদিত হয়। ওয়ার্ল্ড অ্যাটলাস ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ২০১৯ সালে চা উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১১তম। উক্ত বছরে যে পরিমাণ চা হয় তা ২০০৯-১১ সময়কালে গড় উৎপাদিত চায়ের পরিমাণের (৬০,০০০ টন) চেয়ে ৭ শতাংশ বেশি ছিল (আহাম্মেদ ২০১২)। অতীতে মূলত রপ্তানির উদ্দেশ্যেই দেশে চা উৎপাদন হতো তবে বিগত চার দশকে এ ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৮০ এর দশকে বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট চায়ের ৬৮ শতাংশ, ১৯৯০ এর দশকে ৫০ শতাংশ এবং ২০০০ এর দশকে ১৯ শতাশ রপ্তানি হয়েছে (আহাম্মেদ ২০১২)। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এই রপ্তানির হার ৪ শতাংশের নিচে নেমে যায়। ২০১৯ সালে বিশ্ব চা রপ্তানির ০.৫১ শতাংশ বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয় আর এ কারণে বিশ্ব রপ্তানির শীর্ষ ১৫টি দেশের তালিকা থেকে বাংলাদেশ বাদ পড়ে যায়। বিশ্বের বৃহত্তম চা রপ্তানিকারক দেশগুলোর থেকে অনেক পিছনে পড়ে যায় (২০১৯ সালে শীর্ষ দেশগুলোর ক্রম এরকম: চীন, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, ভিযেতনাম – আঙ্কটাডস্ট্যাট তথ্যভাণ্ডার)। এ কারণের পাশাপাশি দেশীয় বাজারে চায়ের চাহিদা প্রবলভাবে বৃদ্ধির কারণে (যা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়েও বেশি, এভাবে মাথাপিছু ভোগও বাড়ে), বাংলাদেশ নিট আমদানিকারক দেশে পরিণত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কিছু এ দেশীয় বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ সরকারকে চা আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরামর্শ দেন (এফ.ই. আইএলও ২০১৬, ২০, ৫৯)। দেশে চা আমদানির পরিমাণও খুব বেশি নয়। ২০১৯ সালে সরকারিভাবে ২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চা আমদানি করা হয়। প্রধান চা রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করার লক্ষ্যে দেশের একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ উৎপাদন খরচ কমানোর পাশাপাশি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন: "....উৎপাদন বাড়াতে হবে চা ক্ষেত্র, কারখানা, শ্রমিক কল্যাণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগের মাধ্যমে।" (আহাম্মেদ ২০১২, ১)। এক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালনের দায়িত্ব বাংলাদেশ চা বোর্ডের অধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এর উপর ন্যস্ত।

বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্যমতে, গত দশকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি মূলত একই পরিমাণ চা উৎপাদন এলাকায় হয়েছিল। ২০১০ এর দশকে কেবল পঞ্চগড় জেলায় কয়েকটি নতুন বাগান গড়ে ওঠে। বর্তমানে দেশের সাতটি জেলায় মোট ১৪৮ টি চা বাগান রয়েছে, যার মধ্যে ১৩১টি বাগান দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট বিভাগের তিনটি জেলায়, ২২টি চট্টগ্রামে, ৯টি পঞ্চগড়ে এবং ২টি দেশের অন্যত্র অবস্থিত (তথ্যসূত্র:বিটিবি; ওয়েবসাইট, চা-বাগান-বাংলাদেশ)। এই বাগানগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। 'এ' ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত বাগানগুলি হলো ডানকান ব্রাদার্স, জেমস ফিনলে, ডিডুন্ডি টি কো, দ্য নিউ সিলেট টি এস্টেট লি: এবং কিছু সংখ্যক অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যার সবগুলিই পুরোপুরি বা আংশিকভাবে যুক্তরাজ্যের মালিকানাধীন। বাংলাদেশের চা ব্যবসায় যুক্তরাজ্যের মালিকানাধীন কোম্পানি প্রাধান্য বিস্তার করে এবং তাদের ফলনও অন্যদের তুলনায় বেশি। দেশের চা উৎপাদন এলাকার ২৫ শতাংশ 'এ' ক্যাটাগরির কোম্পানিগুলোর আওতাভুক্ত এবং দেশের চা উৎপাদনের ৫৮ শতাংশের বেশি উৎপাদন করে এ ক্যাটাগরির কোম্পানিগুলো। 'বি' ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত হলো দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো। এসব কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য ও কাজের গুণমান উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকলেও অদ্যাবধি ফলাফল তেমন আশানুরূপ নয়। 'সি' ক্যাটাগরি মূলত অল্প ফলনশীল ছোট এস্টেটগুলো নিয়ে গঠিত। এখানে কর্মরত শ্রমিকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ২০১৬ সাল নাগাদ চা বাগান এলাকাগুলোতে নিবন্ধিত (৮৯,৮০০) ও অনিবন্ধিত (১৯,৬০০) শ্রমিকসহ মোট ৩,৫৯,০০০ লোক বসবাস করত (আইএলও ২০১৬, ২৭)।

মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ এর আওতায় দেশের দুটি এলাকা চট্টগ্রাম ও সিলেটের ৫টি চা বাগান ও ১৫টি চা এস্টেটের মোট ৪০১ জনের উপর জরিপ করা হয়। প্রতি বাগান বা এস্টেট থেকে সর্বোচ্চ ২৯ জনের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সারণি ৫ থেকে দেখা যাচ্ছে, এই বাগান বা এস্টেটগুলোর মধ্যে একটিতে ১০০ জনের কম, ৭টিতে ১০০-৫০০ জন, ৮টি তে ৫০০-১,০০০ জন বাকী ৪টি বৃহদাকার বাগান বা এস্টেটে ১,০০০ জনের অধিক শ্রমিক নিয়োজিত। দুটি বাগান/এস্টেট বাদে সবগুলোই ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। মালিকানা স্বত্বের দিক দিয়ে ১০টি একক মালিকানা, ৬টি যৌথ মালিকানা এবং ২টি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। এছাড়া ২টি বাগান/ এস্টেট সরকারি মালিকানাধীন।

সারণি ৫: বাংলাদেশের চা বাগান ও এস্টেট, আকার ও মালিকানার ভিত্তিতে

প্রতিষ্ঠানের আকার	১০-১০০	১০০-৫০০	৫০০-১০০০	>১০০০
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১	৭	৮	৪
মালিকানা	ব্যক্তিমালিকানাধীন (একক)	ব্যক্তিমালিকানাধীন (যৌথ)	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	সরকারি/রাষ্ট্রায়ত্ত
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১০	৬	২	২

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট নমুনা/গণসংখ্যা= ১৮৯৪কারখানা প্রদত্ত)

৩। আয়

দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক মজুরি

জরিপে শ্রমিকদের আয় সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন সন্নিবেশিত ছিল সে বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম প্রশ্নের মাধ্যমে মজুরির সময়কাল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে প্রতি ১০ জনে প্রায় ৬ জন শ্রমিক প্রতি মাসে, ২ বা তার অধিক প্রতি সপ্তাহে, এবং ২ জন বা তার কম শ্রমিক প্রতি সপ্তাহে মজুরি পাওয়ার কথা বলেছে। পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় নারী শ্রমিকরা মাসিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে প্রায়শ মজুরি পেয়ে থাকে, যেখানে পুরুষ শ্রমিকরা প্রায়শই দৈনিক মজুরি পেয়ে থাকে। পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি পাওয়ার মূল কারণ হল পুরুষ শ্রমিক অধ্যুষিত নির্মাণখাতে দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি দেয়া হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বাকি তিন খাতে দৈনিক ভিত্তিক মজুরির প্রচলন নেই বললেই চলে। চা বাগান বা এস্টেটগুলোতে যেখানে সাপ্তাহিক মজুরি প্রদান করা হয়, সেখানে তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতে মাসিক মজুরি প্রদান করা হয়। শ্রমিকের বয়স যত কম হবে তারা তত বেশি মাসিক ভিত্তিক মজুরি গ্রহণ করে থাকে। মধ্যস্তার মাধ্যমে নিযুক্ত চুক্তিধারী শ্রমিকরা প্রায়শ মাসিক মজুরি এবং চুক্তিবিহীন শ্রমিকরা প্রায়শ দৈনিক মজুরি পেয়ে থাকে বলে দেখা যায়। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে দৈনিক মজুরি এবং ১,০০০ বা তার অধিক কর্মী নিয়োজিত আছে এমন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মাসিক মজুরি প্রদান স্বাভাবিক বিষয়।

জরিপে ঠিকা মজুরি সম্পর্কিত প্রশ্ন ছিল মাত্র একটি। খুবই কম সংখ্যক শ্রমিক (মাত্র ১ শতাংশ) ঠিকা হারে মজুরি পায় বলে উল্লেখ করেছে। নির্মাণ ও চা শিল্পে কোনো ঠিকা মজুরি নেই। তৈরি পোশাক খাতে ঠিকা মজুরি প্রায় নেই বললেই চলে, এবং চামড়া খাতে মাত্র প্রায় ৩ শতাংশ শ্রমিক ঠিকা হারে মজুরি পায় বলে উল্লেখ করেছে।

চিত্র ১: চার শ্রেণীর মজুরি সময়কালের বিভাজন, লিঙ্গ, বয়স, খাত, চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে

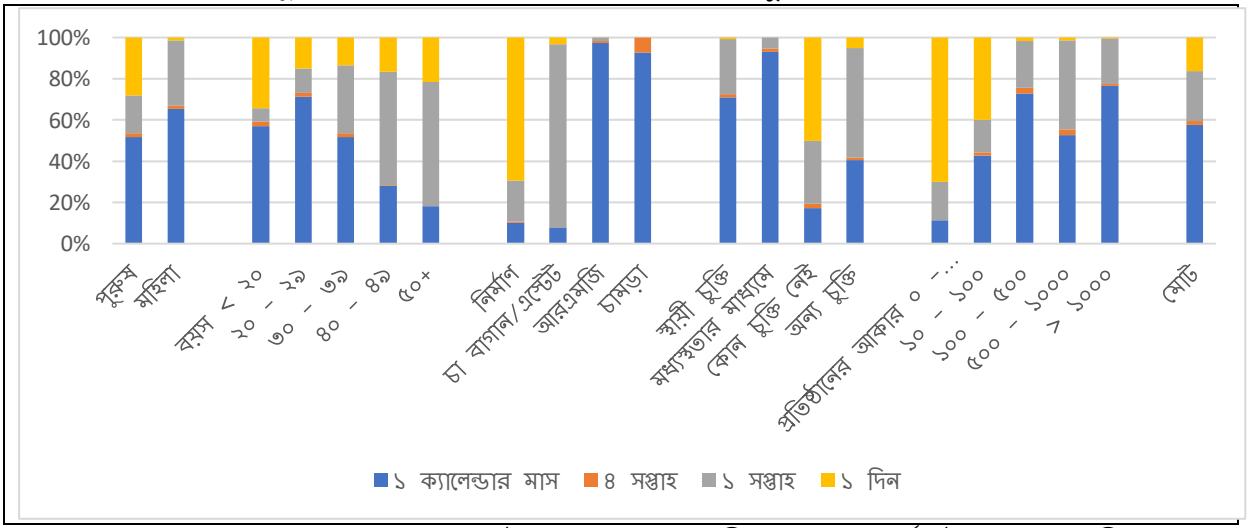

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা=১৮৯৪, মজুরির সময়কাল সম্পর্কে উপাত্ত পাওয়া যায়নি=২)

ঘণ্টাপ্রতি ও মাসিক মজুরি

শ্রমিকদের মজুরি তুলনা করার জন্য ঘণ্টাপ্রতি মজুরি পরিমাপ করতে উল্লিখিত মজুরিকে সাধারণত সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা ও মজুরির সময়কাল দিয়ে ভাগ করা হয়। কর্মঘণ্টা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পঞ্চম অধ্যায় দেখুন। ঘণ্টাপ্রতি মজুরি গণনা করার পর গণনার ভূলভ্রান্তি সংশোধনের জন্য প্রাপ্ত সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ঘণ্টাপ্রতি মজুরির উপরের ও নিচের ১% বাদ দেয়া হয়েছে। মাসিক মজুরি হিসাবের জন্য ঘন্টাপ্রতি মজুরিকে সাপ্তাহিক ৪৮ ঘন্টা এবং মাসে ৪.৩৩ সপ্তাহ দ্বারা গুণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অর্ধকালীন কাজের কর্মঘণ্টার পাশাপাশি একইভাবে খণ্ডকালীন ও মৌসুমী কাজের কর্মঘণ্টাকে বাদ দেয়া হয়েছে। ১,৮৯৪ জন শ্রমিকের মধ্যে ১,৮৫৬ জন অর্থাৎ প্রায় ৯৮ শতাংশ শ্রমিক তাদের প্রকৃত আয় জরিপে উল্লেখ করেছে।

চিত্র ২: প্রযোজ্য নিম্নতম মজুরি হারে বা তার অধিক হারে মজুরি পরিশোধের শতকরা হার, লিঙ্গ, বয়স, খাত, চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে

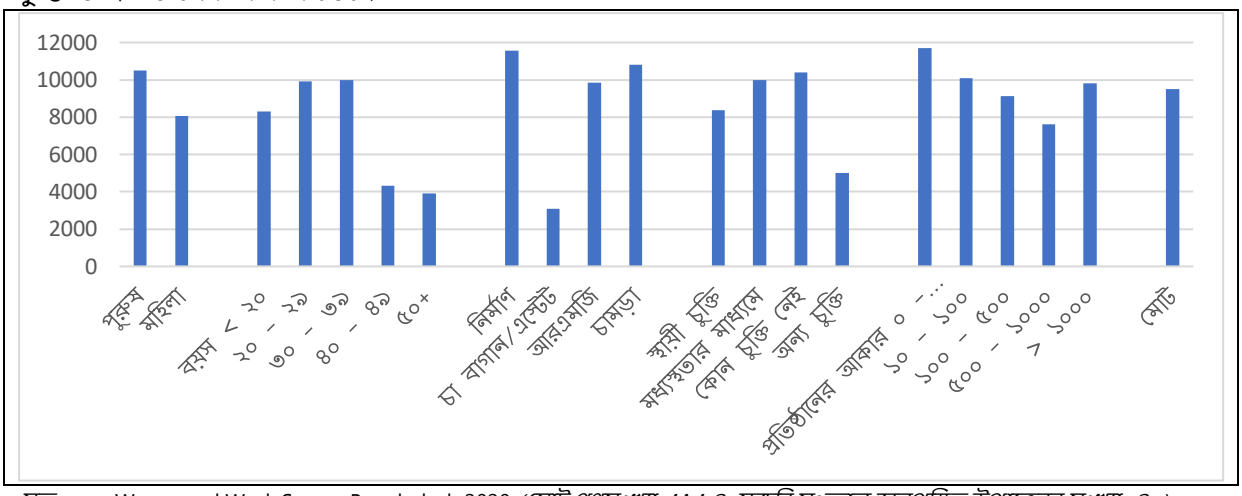

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 *(মোট গণসংখ্যা=১৮৯৪, মজুরি সংক্রান্ত অনুপস্থিত উপাত্তেরর সংখ্যা=৪০)*

চিত্র-২ থেকে দেখা যাচ্ছে, চারটি খাতে সম্মিলিতভাবে শ্রমিকদের মাসিক মজুরির মধ্যমা (মিডিয়ান) বাংলাদেশি টাকায় ৯,৫০০ টাকা। মজুরির মধ্যমা জরিপের উল্লেখিত সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মজুরির মাঝে অবস্থিত।[১৩] নারী শ্রমিকদের মাসিক মজুরির মধ্যমা পুরুষ শ্রমিকদের মাসিক মজুরির মধ্যমার ৭৭ শতাংশের চেয়ে অনেক কম। এতে বেতন বা মজুরির ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে বিরাজমান লিঙ্গবৈষম্যে প্রতিফলিত হয়। আর এই বৈষম্যের মূল কারণ একই কাজের জন্য নারী ও পুরুষকে আলাদা মজুরি প্রদান করা নয়, বরং শ্রমবাজারে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের কাজ লিঙ্গ ভিত্তিতে বিভাজিত থাকে আর তারা এ বিভাজন অনুসারে কাজ করে থাকে। চা বাগান ও এস্টেটগুলোতে কম মজুরির কাজে নারী

[১৩] মজুরির মধ্যমা হল একটি নির্দিষ্ট বিভাগের নিবেশনের সেই মান যা নিবেশনকে সমান দুইভাগে ভাগ করে অর্থাৎ যখন মজুরির মানগুলোকে ক্রমানুসারে বা ছোট থেকে বড় সাজিয়ে রাশিমালার ঠিক মাঝখানে অবস্থান করে ঐ রাশি নেয়া হয়েছে। এটি গড় মজুরির সাথে গুলিয়ে ফেলা সমীচিন নয় কারণ গড় মজুরি হল মজুরি নামক তথ্য সারির অন্তর্ভূক্ত সকল সংখ্যাগুলোর যোগফলকে ঐ তথ্যসারির মানগুলির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তা। মধ্যমার একটি সুবিধা হল যে, এটি প্রান্তীয় বড় বা ছোট মান দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

শ্রমিকদের আধিপত্য রয়েছে। চা খাতের মধ্যমা মজুরি নির্মাণ, তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতে পরিলক্ষিত মধ্যমা মজুরির অর্ধেকের চেয়েও কম (চিত্র ৪)। অধিকন্তু কম বয়সী শ্রমিকদের চেয়ে ৪০ বা তদূর্ধ্ব বয়সী শ্রমিকরা অনেক কম মজুরি পেয়ে থাকে। এর কারণ হিসেবে চা বাগানে বয়স্ক নারী শ্রমিকদের উপস্থিতিকে আংশিকভাবে দায়ী করা যেতে পারে। মধ্যস্ততার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের মজুরির মধ্যমা সবচেয়ে বেশি । পক্ষান্তরে অন্য ধরনের চুক্তিধারী শ্রমিকদের মজুরির মধ্যমা তুলনামূলকভাবে কম ।

চিত্র ৩: প্রযোজ্য নিম্নতম মজুরি হার বা জীবনধারণ উপযোগী মজুরি বা তার চেয়ে বেশি হারে শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের শতকরা হার, লিঙ্গ, বয়স, খাত, চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে

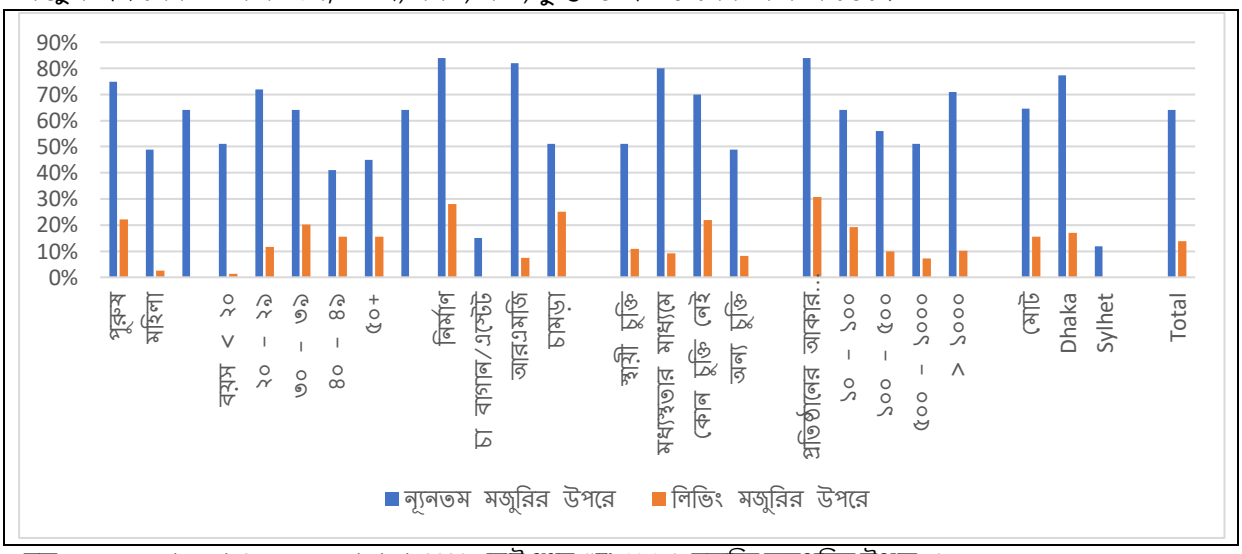

সূত্র : Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা=১৮৯৪, মজুরির অনুপস্থিত উপাত্ত=৪০)

নিম্নতম মজুরি এবং জীবনধারণ-উপযোগী মজুরি

২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশের জাতীয় নিম্নতম মাসিক মজুরি ১,৫০০ টাকা নির্ধারণ করা আছে। ২০২০ সালে জাতীয় নিম্নতম মজুরির প্রকৃত হার বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি বিধায় ৫% বার্ষিক বৃদ্ধি, ৪০% বাড়িভাড়া বৃদ্ধি, ৬০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা এবং ১,২৫০ টাকা ভ্রমণ ও খাদ্য ভাতা যুক্ত করে নিম্নতম মজুরির হার হিসাব করা হয়েছে। সেই অনুসারে ২০২০ সালে বাংলাদেশের জাতীয় নিম্নতম মজুরির পরিমাণ দঁড়ায় ৪,৮০৫ টাকা। যেহেতু চা ও নির্মাণখাতে কোনো খাত-নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন বা নিম্নতম মজুরি নেই সেহেতু জাতীয় নিম্নতম মজুরির হারের সাথে এই খাতগুলোর অর্জিত মজুরির তুলনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তৈরি পোশাক এবং চামড়াখাতে খাত-নির্দিষ্ট নিম্নতম মজুরি রয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে নিম্নতম মাসিক মজুরি ৮,০০০ টাকা এবং চামড়া খাতে কম দক্ষ, আধা- দক্ষ এবং দক্ষ গ্রেডের শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি যথাক্রমে ৯,৩৫০, ১০,৫২০ ও ১৩,৫২০ টাকা (বিস্তারিত দেখুন ১০ম অধ্যায়ে)। জরিপে শ্রমিকদের কর্তৃক উল্লেখিত কাজের পদবীর ভিত্তিতে চামড়া খাতে শ্রমিকদের দক্ষতার স্তর অনুমান করা হয়েছে।

শ্রমিকদের মাসিক মজুরি (যা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে হিসাব করা হয়েছে) কে সংশ্লিষ্ট মাসিক নিম্নতম মজুরির হারের সাথে তুলনা করা হয়েছে। দেখা গেছে, জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের ৬৪ শতাংশ নিম্নতম মজুরি হারে বা তার চেয়ে বেশি হারে মজুরি পেয়ে থাকে। কোন কোন গ্রুপের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এরূপ প্রায়শ হয়ে থাকে তা চিত্র ৩ এ দেখানো হয়েছে । নিম্নতম মজুরি হারে বা তার চেয়ে বেশি হারে মজুরি প্রদানের ঘটনা বেশি ঘটেছে নির্মাণ খাতে আর তুলনামূলকভাবে কম ঘটেছে চা খাতে। নিম্নতম মজুরি হার বা তার বেশি মজুরি প্রদানের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে ১০ জন বা তার কম শ্রমিক নিয়োজিত আছে এমন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে আর সবচেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়েছে ৫০০-১,০০০ শ্রমিক নিয়োজিত আছে এমন প্রতিষ্ঠানে। তবে এরূপ পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কম পরিলক্ষিত হয়েছে।

জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০ থেকে প্রাপ্ত (বিস্তারিত ৪র্থ অধ্যায় দেখুন) জীবনধারণ উপযোগী মজুরির সাথে মাসিক মজুরির তুলনা করা যায়। ন্যূনতম মজুরির চেয়ে জীবনধারণ-উপযোগী মজুরি অনেক বেশি, দশ শতাংশের সামান্য বেশি শ্রমিককে জীবনধারণ-উপযোগী মজুরির চেয়ে বেশি মজুরি দেয়া হয় (চিত্র ৩)। সিলেটে কম মজুরির চা বাগান ও এস্টেটগুলোতে কোনো শ্রমিকই জীবনধারণ উপযোগী মজুরি আয় করে না।

চিত্র ৪: বার্ষিক ভাতা গ্রহণকারী শ্রমিকের শতকরা হার- লিঙ্গ, বয়স, খাত, চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে

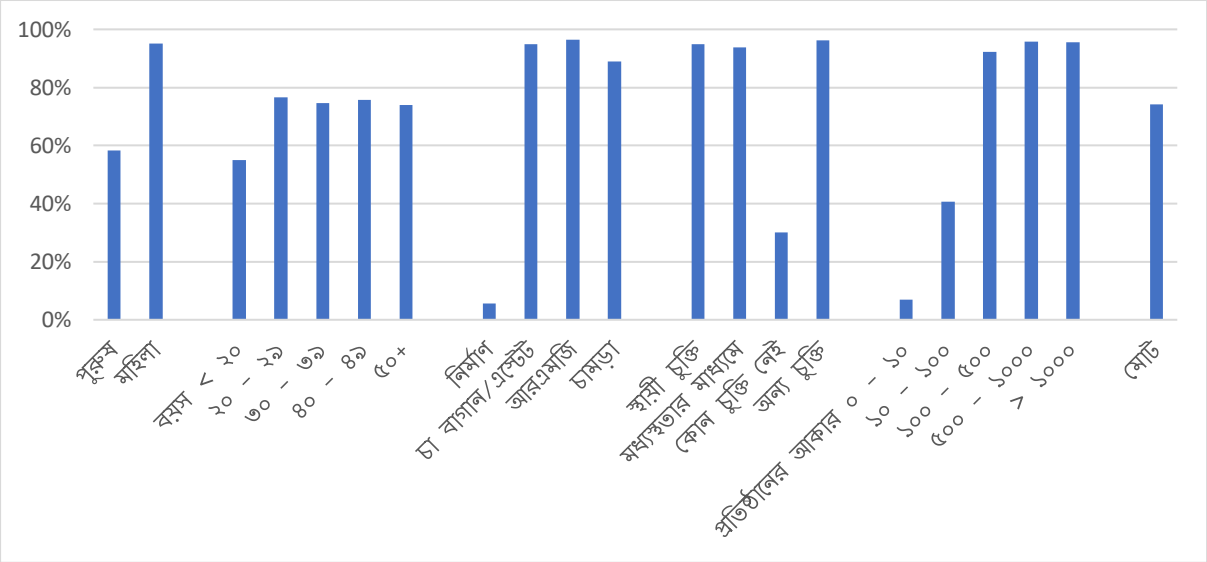

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা=১৮৯৪, বার্ষিক ভাতা সম্পর্কিত অনুপস্থিত উপাত্ত=৪)

বার্ষিক ভাতা/বোনাস

জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের বার্ষিক ভাতা সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় যেমন বছর শেষে বোনাস, ছুটির বোনাস, উৎসব ভাতা বা একই ধরনের অন্যান্য ভাতা। প্রতি ১০ জনে ৭ জন শ্রমিক বার্ষিক ভাতা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছে। চিত্র ৪ থেকে দেখা যাচ্ছে, , নারী শ্রমিকদের চেয়ে কমসংখ্যক পুরুষ শ্রমিক বার্ষিক ভাতা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছে; ২০ বছরের কম বয়সী শ্রমিকরা বার্ষিক ভাতা

পাওয়ার কথা সবচেয়ে কম উল্লেখ করেছে; নির্মাণখাতের শ্রমিকরা কদাচিৎ বার্ষিক ভাতা পেয়ে থাকে; চুক্তিবিহীন শ্রমিকরা অন্য চুক্তিধারী শ্রমিকদের তুলনায় কম সময় বার্ষিক ভাতা পেয়ে থাকেন; এবং বড় কারখানার তুলনায় ছোট কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ভাতা সুবিধা ভোগী শ্রমিকের সংখ্যা কম

চিত্র ৫: সামাজিক নিরাপত্তা, *মজুরিসহ* অসুস্থতাজনিত ছুটি ও চিকিৎসা সুবিধা গ্রহণকারী শ্রমিকদের শতকরা হার- লিঙ্গ, বয়স ও খাত অনুসারে

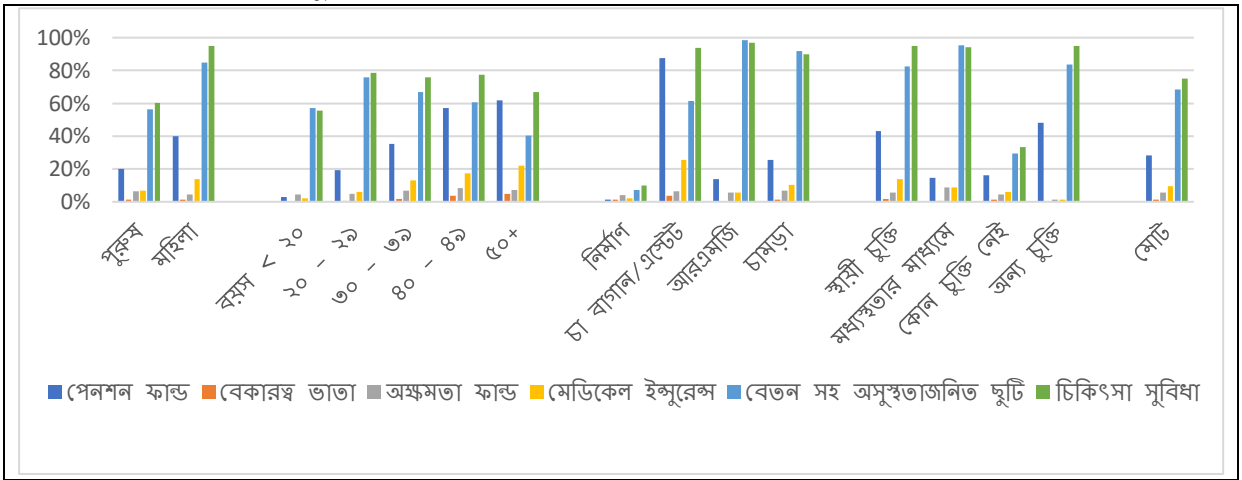

সূত্র: *Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা=১৮৯৪, পেনশন ফান্ড সম্পর্কিত অজানা ও অনুপস্থিত উপাত্ত=১০৫, বেকারত্ব তহবিল=৮৪, অক্ষমতা তহবিল=১২৭,চিকিৎসা বীমা=২১০, বেতনসহ অসুস্থতাজনিক ছুটি=১২, চিকিৎসা সুবিধা=১১)*

সামাজিক নিরাপত্তা

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় যেমন শ্রমিকরা নিজে বা তাদের নিয়োগকর্তারা পেনশন ফান্ড, বেকারত্ব ফান্ড, অক্ষমতা ফান্ড বা অসুস্থতার ক্ষেত্রে সুরক্ষা ফান্ডে অংশগ্রহণ করে কিনা (চিত্র ৫ দেখুন)। প্রতি ১০ জনে প্রায় ৩ জন শ্রমিক পেনশন ফান্ডে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছে এবং চা এস্টেটে এটি অনেক বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। বেকারত্ব ফান্ডে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে আর অক্ষমতা ফান্ডে অংশগ্রহণ থাকলেও তা খুবই নগণ্য। প্রতি ১০ জনে ১ জন শ্রমিক নিয়োগকর্তাদের কর্তৃক চিকিৎসা বীমা সুবিধা প্রদানের কথা বলেছে এবং এ ধরনের সুবিধা প্রদানের বিষয়টি চা বাগানে প্রায়শ পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক সুরক্ষা ফান্ড বা তহবিলে অংশগ্রহণের মাত্রা কম হলেও মজুরিসহ অসুস্থতাজনিত ছুটি এবং চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার কথা বারবার উল্লেখ করেছে জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকরা। প্রতি ১০ জনে ৭ জন শ্রমিক মজুরিসহ অসুস্থতাজনিত ছুটি পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছে। ১০ জনে প্রায় ৮ জনই জানিয়েছে যে, নিয়োগদাতা প্রদত্ত চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্তির সুযোগ তাদের রয়েছে।

সকল ধরনের ফান্ড ও সুবিধায় পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বেশি। বয়স্ক শ্রমিকরা পেনশন তহবিলে বেশি অংশগ্রহণ করে থাকে। মজুরিসহ অসুস্থতাজনিত ছুটি ব্যতীত অন্য সকল ধরনের ফান্ড/তহবিলে অন্য তিন খাতের শ্রমিকদের চেয়ে চা বাগান/এস্টেটে কর্মরত শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বেশি। নির্মাণ খাতে কোনো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই।

কর্মক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ

জরিপে কর্মক্ষেত্র হতে লভ্য সুবিধার ক্ষেত্রে খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র ও যাতায়াত এ চারটি বিষয়ে শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করা হয়। প্রতি ১০ জন শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ২জন খাদ্য, প্রায় ৩ জনের বেশি বাসস্থান, এবং ১ জনের বেশি যাতায়াত সংক্রান্ত সুবিধা পায় বলে জানালেও কেউই পোশাক পাওয়ার কথা বলেনি। চিত্র ৬ এ বস্ত্র বাদে বাকি সুবিধাগুলো বিভিন্ন গ্রুপ ভেদে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুরুষদের তুলনায় নারী শ্রমিকরা এই তিনটি সুবিধা পাওয়ার কথা বেশি উল্লেখ করলেও কমবয়সী শ্রমিকরা কম উল্লেখ করেছে এবং ৫০ বা তদূর্ধ্ব বয়সী শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করেছে। অন্য খাতগুলোর তুলনায় চা বাগান ও এস্টেটের শ্রমিকরা খাদ্য ও আবাসন/বাসস্থান সুবিধার বিষয়টি বেশি উল্লেখ করে: প্রতি ১০ জনে ৯ জন শ্রমিক বলেছে নিয়োগকর্তা বাসস্থান সুবিধা প্রদান করে থাকে। তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতে বেশির ভাগ সময় যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা হয়। মধ্যস্তুতার মাধ্যমে নিয়োগকৃত শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্য ও বাসস্থান সুবিধা পাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে কম। তবে যাতায়াত সুবিধার ক্ষেত্রে তারা স্থায়ী চুক্তিধারী শ্রমিকদের ন্যায় সুবিধা পেয়ে থাকে।

চিত্র ৬: কর্মস্থল থেকে সুবিধা প্রাপ্ত শ্রমিকদের শতকরা হার, লিঙ্গ, বয়স, খাত ও চুক্তি ভেদে

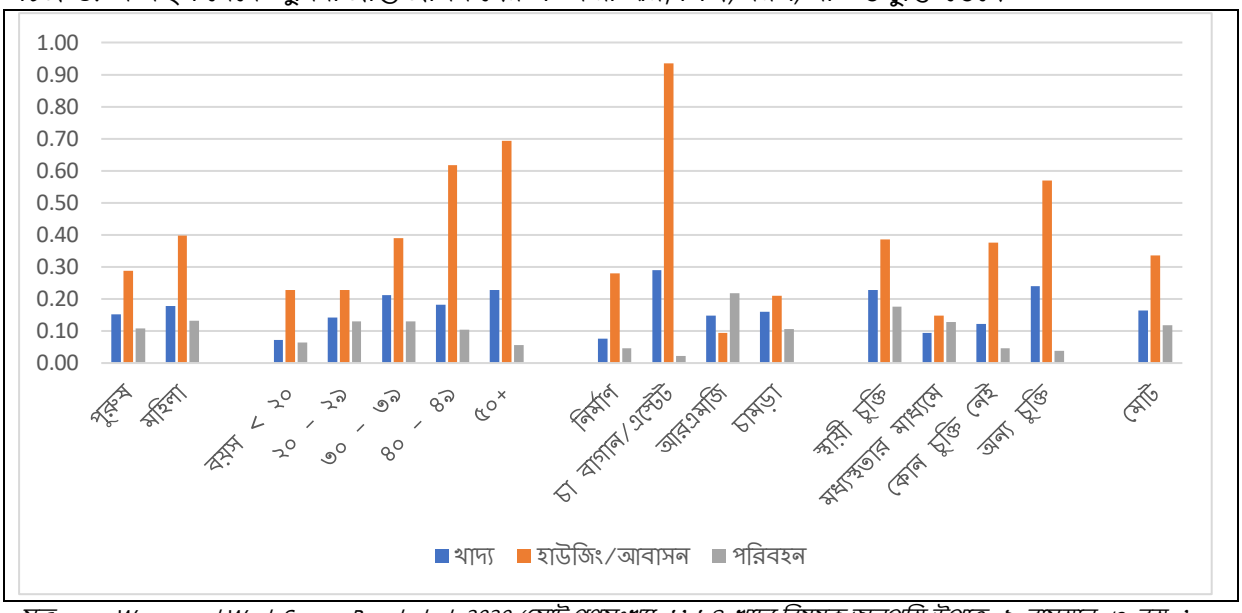

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা=১৮৯৪, খাদ্য বিষয়ক অনুপস্থি উপাত্ত=২, বাসস্থান=৩, বস্ত্র=৮, পরিবহন=৯)

চিত্র ৭: খাত ও অঞ্চল ভেদে ওভারটাইম মজুরির বিন্যস

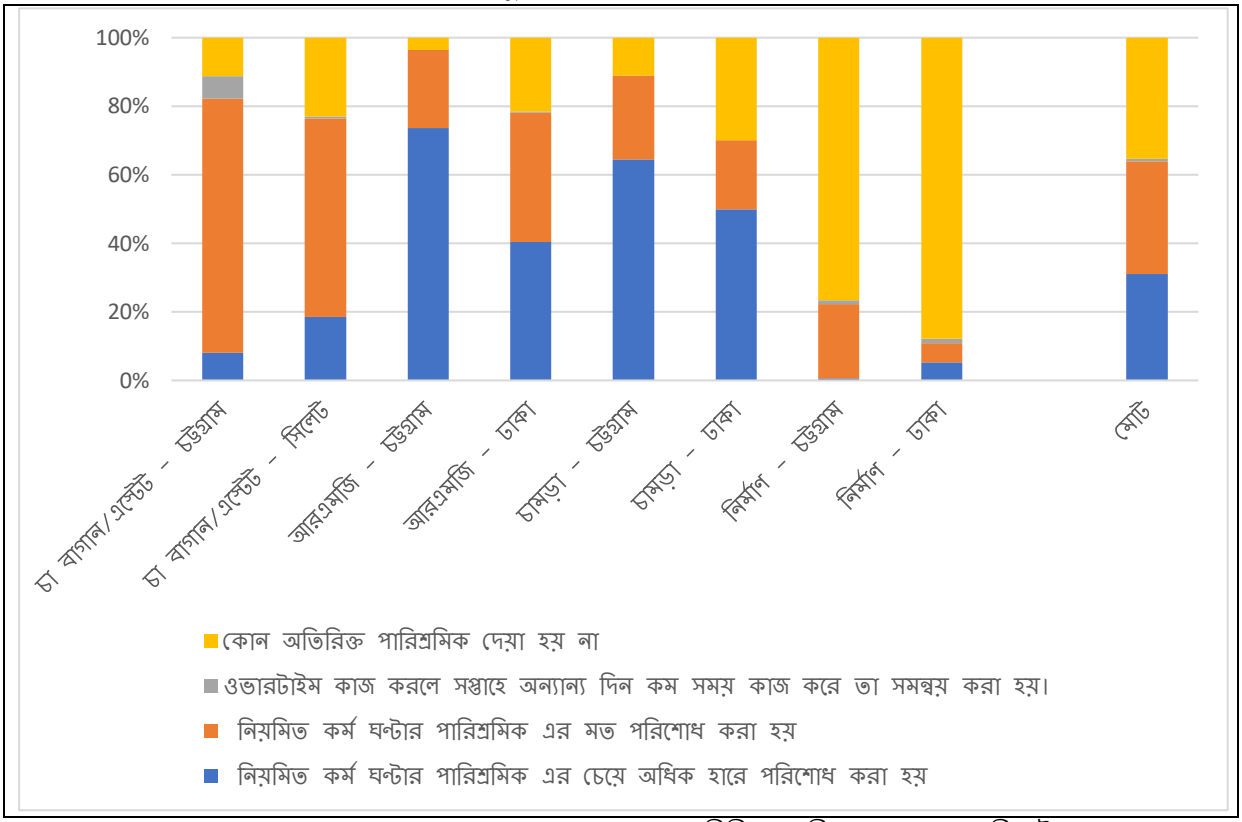

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (গণসংখ্যা-১৮৯৪, অতিরিক্ত মজুরির অজানা ও অনুপস্থিত উপাত্ত=৪৯)

ওভারটাইম মজুরি

ওভারটাইম বা অতিরিক্ত সময়ের কাজের মজুরি কীভাবে দেয়া হয় সে সম্পর্কে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়। সকল শ্রমিকের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে তারা অতিরিক্ত সময় কাজ করে কিনা। প্রতি ৩ জনে প্রায় ১ জন শ্রমিক উল্লেখ করেছে যে ওভারটাইম কাজের মজুরি স্বাভাবিক মজুরির সাথে প্রিমিয়াম সহযোগে প্রদান করা হয় (চিত্র ৭)। প্রতি ৩ জনে ১ জন ওভারটাইম কাজের মজুরি প্রিমিয়াম বাদে স্বাভাবিক কর্মঘণ্টার মজুরি হিসেবে দেয়া হয় এবং প্রতি ৩ জনে মাত্র ১ জনের কিছু বেশি শ্রমিক ওভারটাইম কাজের জন্য মজুরি দেয়া হয় না বলে উল্লেখ করেছে। এই মজুরি না দেয়াটা ঢাকা ও চট্টগ্রামের নির্মাণখাতে বেশি পরিলক্ষিত হয়। যদিও নির্মাণকর্মীরা চুক্তিবদ্ধ দীর্ঘসময় কাজ করে, তাদের ওভারটাইম কাজ বলে তেমন কিছু নেই। সুতরাং ওভারটাইম মজুরি পরিশোধ না করা তেমন বড় সমস্যা নয়। তবে চট্টগ্রামে তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতে সর্বোচ্চ ওভারটাইম কর্মঘণ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং অধিকালীন কাজের পারিশ্রমিক স্বাভাবিক সময়ের পারিশ্রমিকের সাথে প্রিমিয়াম সহযোগে প্রদান করা হয়, যা দীর্ঘ মেয়াদে অতিরিক্ত সময় কাজের ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রণোদনা।

চিত্র ৮: ওভারটাইম মজুরি সময়মতো ও নগদে প্রাপ্ত শ্রমিকদের শতকরা হার, লিঙ্গ, বয়স, খাত ও চুক্তি ভেদে

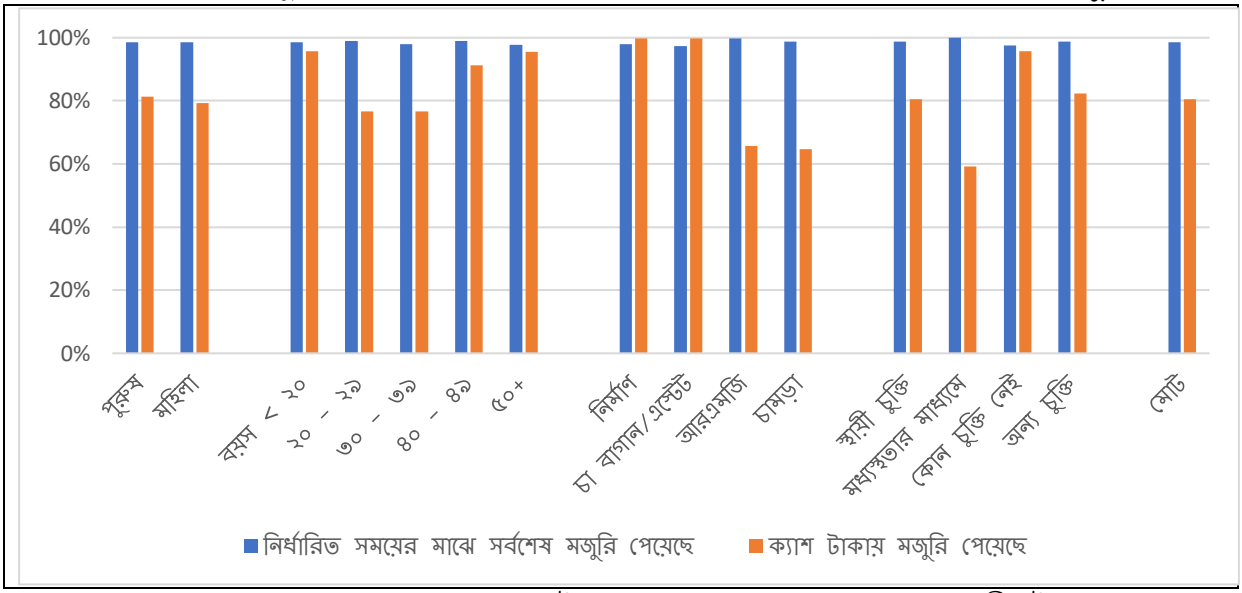

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা=১৮৯৪, কারখানার আয়তনের অনুপস্থিত উপাত্ত=২)

সময়মতো ও নগদে মজুরি প্রদান

জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তারা তাদের সর্বশেষ মজুরি সময়মতো পেয়েছিল কিনা। সমীক্ষাকৃত চারটি খাতের কোনোটিতেই মজুরি বকেয়া থাকার নজির পাওয়া যায়নি (চিত্র ৮ দেখুন)। মাত্র ১ শতাংশ শ্রমিক সময়মতো মজুরি পায়নি বলে উল্লেখ করেছে।

শ্রমআইন ২০১৩ অনুযায়ী যেকোনো ধরনের পারিশ্রমিক অবশ্যই বৈধ পদ্ধতিতে দিতে হবে এবং কিছু ক্ষেত্রে তা শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাবে টাকা ট্রান্সফার বা অন্য ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে দিতে হবে।[১৪] শ্রমিকদের কাছে জানতে চাওয়া হয় যে তারা মজুরি নগদে নাকি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেয়ে থাকে। প্রতি ১০ জন শ্রমিকে ৮ জন নগদে মজুরি পেয়ে থাকে বলে জানিয়েছে (চিত্র ৮ দেখুন)। এটি নারী ও পুরুষ শ্রমিক উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। ২০-২৯ এবং ৩০-৩৯ বছর বয়স গ্রুপের শ্রমিকরা অন্য বয়স গ্রুপের শ্রমিকদের তুলনায় খুব কম ক্ষেত্রেই নগদে মজুরি পেয়ে থাকে। চা বাগান ও চা এস্টেট এবং বিশেষ করে নির্মাণখাতে নগদে মজুরি পরিশোধ করা হয় যা চামড়া ও তৈরি পোশাক খাতে কম পরিলক্ষিত হয়। আরও দেখা গেছে কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের আয়তন যত ছোট হয় নগদে মজুরি পরিশোধ তত বেশি হয়।

[১৪] দেখুন https://mywage.org.bd/labour-laws/work-and-wages

চিত্র ৯: বেতন বৃদ্ধির আবেদন ও বৃদ্ধি প্রাপ্তির বিন্যাস (লিঙ্গ, বয়স, খাত ও প্রতিষ্ঠানের আকার অনুসারে)

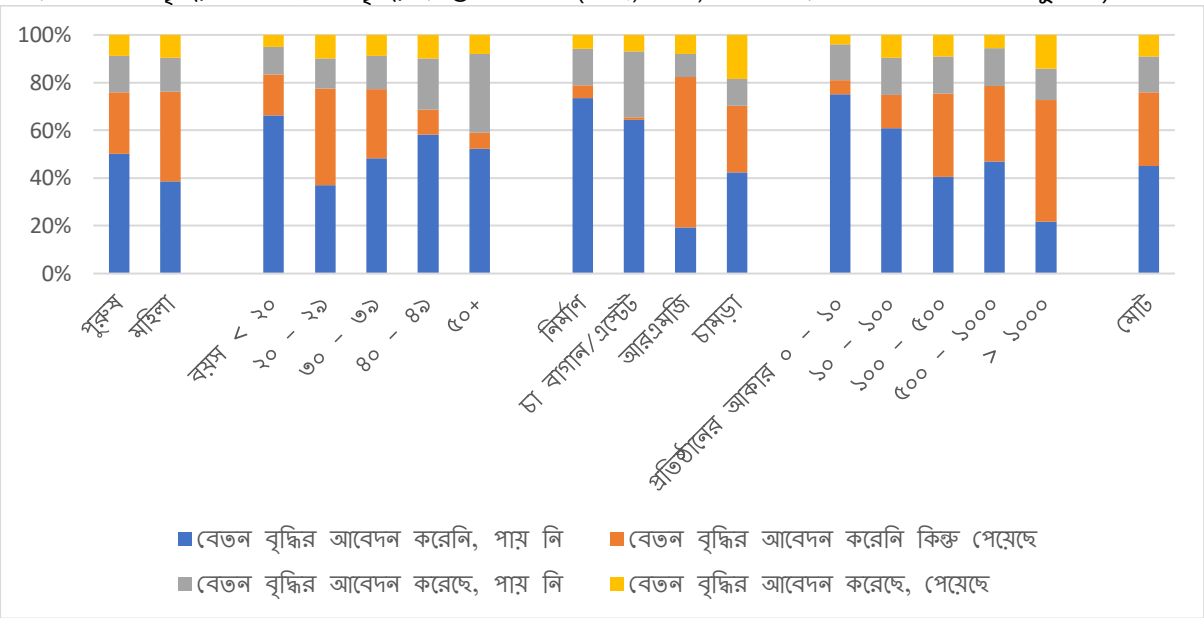

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা=১৮৯৪,বেতন বৃদ্ধির আবেদন সংক্রান্ত অনুপস্থিতি তথ্য=৯, বেতন বৃদ্ধির আবেদন করেছে এবং পেয়েছে=১০)

বেতন বৃদ্ধি

জরিপে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কিত দু'টি প্রশ্ন অন্তর্ভূক্ত করা হয়: বিগত ১২ মাসে তারা বেতন বৃদ্ধির আবেদন করেছিল কিনা এবং বিগত ১২ মাসে তাদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছিল কিনা। চিত্র ৯ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রায় অর্ধেক সংখ্যক কর্মীর বেতন বাড়েনি এবং তারা বেতন বৃদ্ধির আবেদনও করেনি। প্রতি ১০ জনে ৩ জনের ক্ষেত্রে আবেদন না করা সত্ত্বেও বেতন বাড়ানো হয়েছে। ১০ জনে ১ জনের বেশি কর্মীর ক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধির আবেদন করলেও বেতন বাড়ানো হয়নি। তবে প্রতি ১০ জনে ১ জনের কিছু কম জনের ক্ষেত্রে বেতন বাড়ানোর আবেদন করা হলে বেতন বাড়ানো হয়েছে। যেসব কর্মী বেতন বৃদ্ধির আবেদন কম করেছে, তাদের বেতন বৃদ্ধির আবেদন, যারা আবেদন করেনি তাদের তুলনায় বেশি গৃহীত হয়েছে।

চিত্র ৯ এ দেখানো হয়েছে যে, বেতন বৃদ্ধির আবেদন না করা সত্ত্বেও নারী কর্মীদের চেয়ে পুরুষ কর্মীদের ক্ষেত্রে কম সংখ্যকের বেতন বাড়ানো হয়েছে। অন্য বয়সের কর্মীদের চেয়ে ২০-২৯ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে বেশি সংখ্যকের মজুরি বাড়ানো হয় (মজুরি বৃদ্ধির আবেদন না করা সত্ত্বেও)। বেতন বৃদ্ধির আবেদন না করা সত্ত্বেও অন্য খাতগুলোর তুলনায় তৈরি পোশাক খাতের মজুরি বাড়ানো শ্রমিকের সংখ্যা বেশি এবং ছোট প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বড় প্রতিষ্ঠানে প্রায়শ মজুরি বাড়ানো হয়।

বেতন নিয়ে সন্তোষ

বেতন নিয়ে সন্তোষ বিষয়ে জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মাত্র একটি প্রশ্ন করা হয়: "আপনি আপনার বেতন নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট? এ প্রশ্নটির উত্তরের বিস্তার খুবই অসন্তুষ্ট (=১) থেকে খুবই সন্তুষ্ট (=৫) পর্যন্ত।

এই স্কেলে ৩.১ মান মজুরি সন্তুষ্টির প্রায় মাঝামাঝি অবস্থিত। চিত্র ১০ এ দেখানো হয়েছে যে, নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সন্তোষের মাত্রা সমান, অন্য শ্রমিকদের চেয়ে ২০-২৯ বছর বয়সী শ্রমিকরা বেশি সন্তুষ্ট, নির্মাণ এবং চা বাগান ও এস্টেট শ্রমিকদের চেয়ে তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকরা বেশি সন্তুষ্ট, এবং কারখানার আকার মজুরি নিয়ে সন্তোষের ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। চিত্র থেকে আরও দেখা যাচ্ছে, যাদের বেতন বাড়েনি তাদের চেয়ে যাদের বেতন বেড়েছে তারা বেশি সন্তুষ্ট। বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদনকারী শ্রমিকরা আবেদন না করা শ্রমিকদের চাইতে কম সন্তুষ্ট। উভয় ফলাফল-ই পরিসংখ্যানিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

চিত্র ১০: বেতন নিয়ে গড় সন্তোষ *(১=অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, ৫ = অত্যন্ত সন্তুষ্ট)*

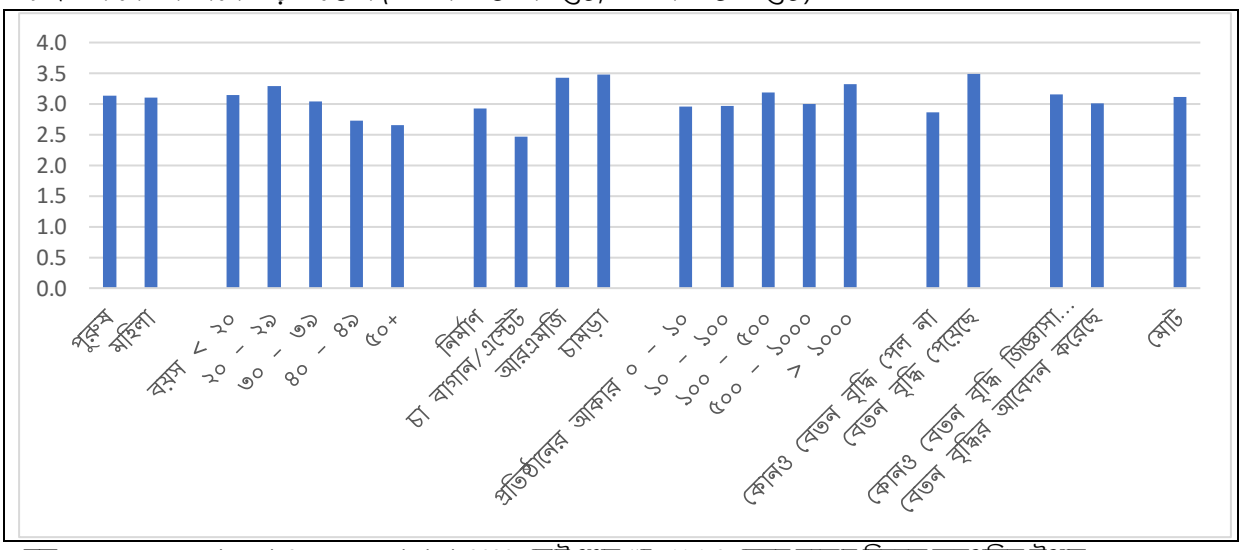

সূত্র: *Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্য =১৮৯৪, বেতন সন্তোষ বিষয়ক অনুপস্থিত উপাত্ত= ৩)*

৪। বাংলাদেশে জীবনধারণ-উপযোগী মজুরি

জীবনধারণ উপযোগী মজুরির ধারণা

ওয়েজইন্ডিকেটর এর জীবনধারণ উপযোগী মজুরির উদ্দেশ্য হলো এমন একটি মজুরি স্তর প্রদান করা যা দিয়ে একটি পরিবার মানসম্মত বা শোভন জীবনযাপন করতে পারে। এটি একটি পরিবারের খাদ্য, আবাসন, যাতায়াত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি, ফোন ও পোশাকের ব্যয় এবং তার সাথে অন্যান্য খরচের জন্য আরও ৫% প্রান্তিক ব্যয় সমন্বিত একটি সর্বমোট মাসিক ব্যয়ের ধারনা প্রদান করে। যেসব এলাকার মানুষের আয় তুলনামূলকভাবে কম সেসব এলাকা থেকে *জীবনধারণ ব্যয় জরিপের* মাধ্যমে এসব খরচ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জরিপে উত্তরদাতাদের প্রায় ৮০টি খাদ্য সামগ্রীর দাম সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হযেছে যেগুলো প্রতিটি দেশের ব্যয়-কাঠামোর সাথে সমন্বিত। পরিশিষ্ট ৩ –এ বাংলাদেশে ব্যবহৃত জীবনধারণ ব্যয় জরিপ সংযুক্ত করা হয়েছে। এই জরিপে ৬১টি খাদ্যপণ্যের মুল্য পরিমাপ করা হয়েছে। কারণ যে সকল পণ্য বাংলাদেশের বাজারে বিক্রয় করা হয় না সেগুলো বাদ দেয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তির দৈনিক খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে কত টাকা প্রয়োজন তা হিসাব করতে, খাদ্য সম্ভার (food basket) মাথাপিছু দৈনিক ২,১০০ ক্যালোরি খাদ্যগ্রহণের সমতুল্য করা হয়, যা বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির পরিমাণ। হিসাবের ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় যে, সমস্ত খাবার ঘরে প্রস্তুত করা হয় এবং খাদ্য উপাদান বা উপকরণ সুপারমার্কেট বা বাজার থেকে নিম্ন পরিসীমা দামে ক্রয় করা হয়। শিশুরা ও প্রাপ্তবয়স্কদের সমান খাবার গ্রহণ করে বলে ধরে নেয়া হয়। জীবনধারণ উপযোগী মজুরি (লিভিং ওয়েজ) হিসাবের জন্য *জীবনধারণ ব্যয় জরিপে* ৬১টি খাদ্যপণ্যের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৩৩ টি পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হয়। সুতরাং প্রতিটি বিভাগ/অঞ্চলে সর্বমোট ২,০১৩টি পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। এজন্য জরিপভুক্ত তিনটি অঞ্চলের জন্য সর্বমোট ১৯,২৫২টি মূল্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

আবাসন ব্যয় এক বিশেষ ধরনের ও ভিন্নধর্মী ব্যয়। কারণ আবাসনগুলো একই ধরনের হয় না এবং এলাকা ভেদে তাদের মূল্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপক তারতম্য দেখা যায়। এজন্য আবাসন ব্যয় পরিমাপে গুণগত মানদণ্ড বিবেচনায় নেয়া উচিত এবং যা ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য আবাসন মানের পরিমাপ থেকে আলাদা (উদাহরণস্বরূপ, যথাযথ কক্ষ সংখ্যা, অবস্থান)। *জীবনধারণ ব্যয় জরিপে* উত্তরদাতাদেরকে তাদের বাড়িভাড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়; বিদ্যুৎ, পানি, আবর্জনা সংগ্রহ, ইন্টারনেট, এবং আবাসনের উপর আরোপিত কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) উল্লিখিত ভাড়াগুলোর অন্তর্ভুক্ত করবে কিনা তা নিজেরা ঠিক করে। এছাড়া উত্তরদাতারা তাদের অ্যাপার্টমেন্ট বা বাড়ির আকার এবং বাড়ির অবস্থানও (শহরের কেন্দ্রস্থলে বা বাইরে) নির্দেশ করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে স্টেট-অফ-আর্ট ইকনোমেট্রিক টুলস বা হাতিয়ার ব্যবহার করে একটি আদর্শ আবাসনের ব্যয় সম্পর্কে পূর্বাভাস করা হয়।

যেকোনো পরিবারের জন্য যাতায়াত খরচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেককেই তাদের জীবিকার প্রয়োজনে বা দৈনন্দিন কাজে যাতায়াত অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হয়, যেমন বাজার করা বা অন্যান্য কেনাকাটা করা। এখানে ধরে নেয়া হয়েছে যে, জীবনধারণ উপযোগী মজুরির মধ্যে মোটরসাইকেল বা গাড়ির মালিকানা অন্তর্ভুক্ত নয় এবং প্রত্যেক পরিবারকে যাতায়াতে অন্যান্য বাহনের উপর নির্ভর করতে হয়। যেহেতু বেশিরভাগ শহরে গণপরিবহন সহজলভ্য, তাই একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্যে নিয়মিত মাসিক পাসের দাম (বা প্রতি মাসে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করে যাতায়াতের খরচ) যাতায়াত ব্যয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই মাসিক পাসের গড় মূল্য যাতায়াত ব্যয়ের অর্থপূর্ণ সম্ভাব্য খরচ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এমনকি যে সব এলাকায় কোনো স্থানীয় গণপরিবহনের ব্যবস্থা নেই সেসব এলাকার পরিবারগুলির জন্যেও।

বক্স ১: জীবনধারণ ব্যয় জরিপের গবেষণা পদ্ধতি

২০১৪ সাল থেকে ওয়েজইন্ডিকেটর ফাউন্ডেশন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এবং একটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জীবনধারণ উপযোগী মজুরি পরিমাপে *জীবনধারণ ব্যয় জরিপটি* ব্যবহার করে আসছে । ওয়েজইন্ডিকেটর এই বহুভাষী জরিপটি বাংলাদেশ সহ ১৪০টি দেশে পরিচালনা করে। এই জরিপগুলো ওয়েজইন্ডিকেটরের বিভিন্ন দেশের ওয়েবসাইটে পোষ্ট করা হয় এবং ওয়েব দর্শনার্থীদেরকেও মূল্য সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ করার জন্য বলা হয়। এই পদ্ধতির মাধ্যমে একটি দেশের এমনকি সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্যেও মূল্য সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ওয়েজইন্ডিকেটর সাক্ষাতকার গ্রহণকারীদের উপর নির্ভর করে যারা দোকান বা বাজারে পর্যবেক্ষণ করে যে মূল্য দেখতে পায় তাই নথিভুক্ত করে। দেশের নির্বাচিত তিনটি বিভাগ চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেটের পাশাপাশি চতুর্থ অঞ্চল রাজশাহীতেও *জীবনধারণ ব্যয় জরিপ* পরিচালনা করা হয়।

বিআইডিএস এবং ওয়েজইন্ডিকেটর জরিপের জন্য ছোট-বড় উভয় ধরনর জেলা চিহ্নিত করে। এমনকি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত এলাকাগুলোকে জরিপের আওতাভুক্ত করা হয়। পূর্বনির্ধারিত এলাকাগুলো গ্রামীণ এলাকা ছিল না তবে নমুনায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী নিম্ন এবং নিম্ন-মাঝারি আয় গ্রুপ থেকে উত্তরদাতা পেতে (পরিশিষ্ট ১ দেখুন) জেলার অন্তর্ভুক্ত উপজেলা নির্বাচন করা হয়। খাদ্যপণ্যের মূল্য/দাম সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীরা দোকান ও বাজার থেকে সরাসরি সংগ্রহ করে। আবাসন ও যাতায়াত ব্যয় বিষয়ে উত্তরদাতাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়। সাক্ষাৎকারের আগেই তাদের জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত করা হয় যে নিম্ন আয় বা নিম্ন-মাঝারি আয় শ্রেণীকরণের তিনটি শর্তের মধ্যে কমপক্ষে একটি শর্ত পূরণ করে কিনা। এ তিনটি শর্তের মধ্যে প্রথমটি হলো উত্তরদাতা "আধা পাকা" অথবা "কাঁচা" ঘরে বসবাস করে- অর্থাৎ ঘরটির দেয়াল/ছাদ টিনের অথবা ঘরে আনফিনিশড দেয়াল বা মেঝে আছে। দ্বিতীয়ত, উত্তরদাতা অন্য একটি পরিবার বা খানার সাথে একই টয়লেট ব্যবহার করে। তৃতীয়ত, উত্তরদাতার খানায় কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। এই তিনটির যেকোনো একটি শর্ত পূরণ হলেই উত্তরদাতাকে জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু বিআইডিএস থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তরদাতাদের ফোন করে তথ্য যাচাই করা হয়।

২০২০ সালের ২০ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পর, বিআইডিএস এর ২টি জরিপ দল (প্রতি দলে ৫জন সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী ও একজন সুপারভাইজার) ট্যাবলেট কম্পিউটারের সাহায্যে উপাত্ত সংগ্রহ শুরু করে। প্রকল্পের সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী ও সুপারভাইজারদের বিআইডিএস থেকে নিয়োগ চুক্তিপত্র দেয়া হয়েছিল। সুপারভাইজারদ্বয় এবং কিছু সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর বিআইডিএস-এ প্রকল্প কাজর পূর্বঅভিজ্ঞতা ছিল। সুপারভাইজাররা তাদের

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। মজুরি জরিপের কাজ শুরুর আগেই সকল অঞ্চলের জীবনধারণ ব্যয় সংক্রান্ত উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

বিভিন্ন পরিবারের জীবনধারণ ব্যয়

বিভিন্ন ধরনের খানা/পরিবারের জন্য খাদ্য, আবাসন ও যাতায়াত ব্যয় ওয়েজইন্ডিকেটর এর জীবনধারণ উপযোগী মজুরি পরিমাপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মূলত তিন ধরনের খানা চিহ্নিত করা হয়, যথা একসদস্যবিশিষ্ট পরিবার, দুজন কর্মজীবী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও দুটি সন্তানের সমন্বয়ে গঠিত একটি আদর্শ (২+২) পরিবার, এবং একটি সাধারণ পরিবার। সাধারণ পরিবারের গঠনকাঠামো বাংলাদেশে প্রচলিত পরিবার কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ পরিবারের সন্তান সংখ্যা জাতীয় উর্বরতার হারের উপর ভিত্তিশীল এবং ধরে নেয়া হয়েছে যে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত এবং অন্য প্রাপ্তবয়স্কের কর্মসংস্থানের হার জাতীয় কর্মসংস্থান হার থেকে প্রাপ্ত। সবশেষে জীবনধারণ উপযোগী ব্যয় পরিমাপে ধরে নেয়া হয় যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় বয়সের এবং দক্ষতার সাথে পরিবারের আয়-ব্যয় পরিচালনা করতে সক্ষম। আরও ধরে নেয়া হয় যে, পরিবারের সকল সদস্য সুস্থ আছে। বাংলাদেশে একটি সাধারণ পরিবারে কাজের নিবিড়তা ১.৫৮। এর অর্থ পিতা-মাতা বা স্বামী-স্ত্রীর যেকোনো একজন পূর্ণকালীন কাজ করে এবং অন্যজনের কাজের নিবিড়তা বা ইনটেনসিটি ৫৮ শতাংশ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রদেয় করকে মজুরি পরিমাপে বিবেচনা করা হয়নি। তাই নিট এবং মোট লিভিং ওয়েজ কোইনসাইড করে বা অনুরূপ।

বাংলাদেশের চারটি অঞ্চলের জন্য তৈরি জীবনধারণ উপযোগী মজুরি গ্রাফে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মাসিক নিম্নতম মজুরি, তিন ধরনের খানার মাসিক জীবনধারণ উপযোগী মজুরি, এবং মজুরি ও কাজ জরিপ বাংলাদেশ (*Wages and Work Survey Bangladesh*) অনুযায়ী দেশের সবচেয়ে সুলভ "আধা-দক্ষ" শ্রেণীর শ্রমিকদের মাসিক আয়। এই দক্ষতা গ্রুপের আয়ের বিভাজনে ২৫তম, ৫০তম এবং ৭৫তম ডেসাইলের জন্য মাসিক আয়ের স্তরগুলি উপস্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং যদি ১০০ জন শ্রমিকের উপার্জনকে নিম্ন থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত সাজানো হত তবে পরবর্তী অনুচ্ছেগুলোর তথ্য- চিত্রগুলি ২৫তম, ৫০তম এবং ৭৫তম ডেসাইল গ্রুপের কর্মীদের উপার্জন প্রদর্শন করে বা দেখায়। মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ এ অন্তর্ভুক্ত বেশির ভাগ কর্মী আধা-দক্ষ শ্রেণীভুক্ত।

চট্টগ্রাম অঞ্চল

জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০ অনুযায়ী চট্টগ্রামে একটি পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য পিতা-মাতা দুজনের একত্রে আয় সর্বমোট ২০,৫৪৯ টাকা (সারণি ৬)। সুতরাং একটি সাধারণ পরিবারের ক্ষেত্রে পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জীবনধারণ উপযোগী মজুরি ১৩,০০০ টাকা।

সারণি ৬: চট্টগ্রামে জীবনধারণ ব্যয় ও জীবনধারণ উপযোগী মজুরি (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০)

ব্যয়ের খাত	সাধারণ পরিবার	আদর্শ পরিবার	একজন-প্রাপ্তবয়স্ক
খাদ্য	৮,৪৮৭ – ৯,৮১৫	৮,২৮০ – ৯,৫৭৬	২,০৭০ – ২,৩৯৪
আবাসন	৭,৪৭০ – ৮,৫০০	৭,৪৭০ – ৮,৫০০	৩,২২০ – ৩,৭৬০
যাতায়াত	১,৪৩০ – ১,৭০০	১,৪৩০ – ১,৭০০	৭১৫ – ৮৫০
স্বাস্থ্যসেবা	৪৮৪ – ৬৬৪	৪৭২ – ৬৪৮	১১৮ – ১৬২
শিক্ষা	৮৭৮ – ১,৩১৩	৮৩৬ – ১,২৫০	-
কাপড়	৬৪৮ – ৮২০	৬৩২ – ৮০০	১৫৮ – ২০০
পানি	১০৩ – ১১৫	১০০ – ১১২	২৫ – ২৮
ফোন	৭২ – ১১০	৭২ – ১১০	৩৬ – ৫৫
অন্যান্য	৯৭৯ – ১,১৫২	৯৬৫ – ১,১৩৫	৩১৭ – ৩৭২
সর্বমোট	২০,৫৪৯ – ২৪,১৮৯	২০,২৫৭ – ২৩,৮৩১	৬,৬৫৯ – ৭,৮২১
নিট লিভিং ওয়েজ	১৩,০০৬ – ১৫,৩০৯	১১,২৫৪ – ১৩,২৩৯	৬,৬৫৯ – ৭,৮২১
গ্রস লিভিং ওয়েজ (রাউন্ডেড/মার্জিত)	১৩,০০০ – ১৫,৩০০	১১,৩০০ – ১৩,২০০	৬,৬৬০ – ৭,৮২০

সুত্রঃ বাংলাদেশ জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০, চট্টগ্রাম।

চিত্র ১১: চট্টগ্রামে জীবনধারণ উপযোগী মজুরি (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, নিম্নসীমার মূল্যানুমান/আনুমানিক হিসাব)

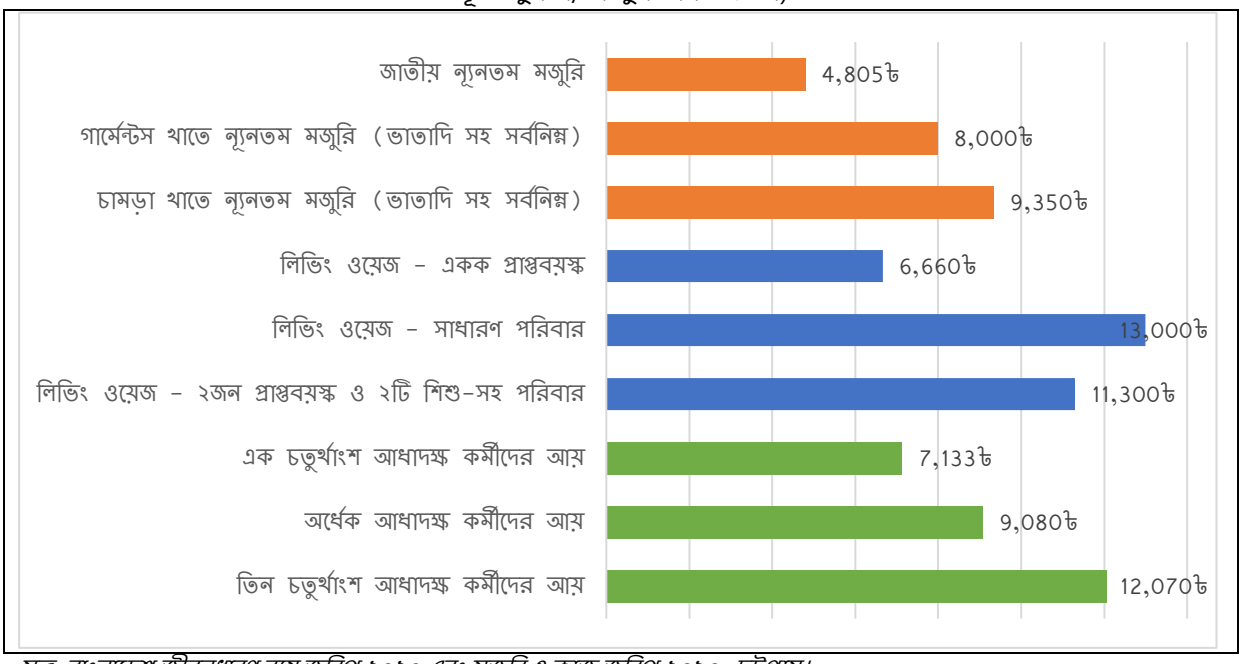

সূত্র: বাংলাদেশ জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০ এবং মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০,, চট্টগ্রাম।

চিত্র ১১ থেকে দেখা যাচ্ছে, চট্টগ্রামের ২৫তম "আধা- দক্ষ" শ্রমিকের আয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জীবনধারণ উপযোগী ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু একটি (২+২) আদর্শ পরিবার বা সাধারণ পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। ৫০তম আধা-দক্ষ শ্রমিকের আয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এবং একটি ২+২ আদর্শ পরিবারের জীবনধারণ উপযোগী ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট কিন্তু সাধারণ পরিবারের ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট নয়। ৭৫তম কম দক্ষ শ্রমিকের আয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি, একটি ২+২ আদর্শ

পরিবার এবং একটি সাধারণ পরিবারের জীবনধারণ উপযোগী ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট। দেশের বর্তমান নিম্নতম মজুরি হার তিন ধরনের আধা-দক্ষ কর্মীর আয়ের চেয়ে কম।

ঢাকা অঞ্চল

জীবনযাত্রার ব্যয় জরিপ ২০২০ এর ভিত্তিতে ঢাকায় একটি পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল ব্যয় নির্বাহের জন্য স্বামী-স্ত্রীর আয় একত্রে সর্বমোট ২২,৬৭৩ টাকা (সারণি ৭) হওয়া দরকার। সুতরাং একটি সাধারণ পরিবারের পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জীবনধারণ উপযোগী ব্যয় ১৪,৪০০ টাকা।

সারণি ৭: ঢাকার জীবনধারণ ব্যয় ও জীবনধারণ উপযোগী মজুরি পরিমাপ (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০)

	সাধারণ পরিবার	আদর্শ পরিবার	একজন-প্রাপ্তবয়স্ক
খাদ্য খরচ	৯,৬৫১ – ১৪,৭৬০	৯,৪১৬ – ১৪,৪০০	২,৩৫৪ – ৩,৬০০
আবাসন খরচ	৮,৩৮০ – ১,০৪০	৮,৩৮০ – ১০,৪০০	৩,৭৬০ – ৪,৪৯০
যাতায়াত খরচ	১,৩০২ – ১,৮৮৬	১,৩০২ – ১,৮৮৬	৬৫১ – ৯৪৩
স্বাস্থ্যসেবা খরচ	৪৮৪ – ৭০৫	৪৭২ – ৬৮৮	১১৮ – ১৭২
শিক্ষা খরচ	৯৮৩ – ১,৭৯৬	৯৩৬ – ১,৭১০	০
কাপড় খরচ	৫৪৫ – ৮৬৯	৫৩২ – ৮৪৮	১৩৩ – ২১২
পানি খরচ	১৭২ – ২৫০	১৬৮ – ২৪৪	৪২ – ৬১
ফোন খরচ	৭৬ – ১১৪	৭৬ – ১১৪	৩৮ – ৫৭
অন্যান্য খরচ	১,০৮০ – ১,৫৩৯	১,০৬৪ – ১,৫১৫	৩৫৫ – ৪৭৭
সর্বমোট খরচ	২২,৬৭৩ – ৩২,৩১৯	২২,৩৪৬ – ৩১,৮০৫	৭,৪৫১ – ১০,০১২
নেট লিভিং ওয়েজ	১৪,৩৫০ – ২০,৪৫৫	১২,৪০৫ – ১৭,৬৬৯	৭,৪৫১ – ১০,০১২
গ্রস লিভিং ওয়েজ (মার্জিত)	১৪,৪০০ – ২০,৫০০	১২,৪০০ – ১৭,৭০০	৭,৪৫০ – ১০,০১০

সুত্রঃ বাংলাদেশ জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০, ঢাকা।

চিত্র ১২ থেকে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগের ২৫তম আধা- দক্ষ শ্রমিকের আয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জীবনধারণ উপযোগী মজুরির তুলনায় যথেষ্ট হলেও একটি (২+২) আদর্শ পরিবার বা সাধারণ পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। ৫০তম আধা-দক্ষ শ্রমিকের আয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির এবং একটি (২+২) আদর্শ পরিবারের জীবনধারণ উপযোগী ব্যয় মেটানোর জন্য যথেষ্ট, কিন্তু একটি সাধারণ পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। ৭৫তম আধা-দক্ষ শ্রমিকের আয় একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির, একটি (২+২) আদর্শ পরিবার এবং একটি সাধারণ পরিবারের জীবণধারণ উপযোগী ব্যয় মেটানোর জন্য যথেষ্ট। দেশের বিদ্যমান নিম্নতম মজুরি এই তিন ধরনের আধাদক্ষ কর্মীর মজুরির চেয়ে কম।

চিত্র ১২: ঢাকায় জীবনধারণ উপযোগী মজুরি (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, নিম্নসীমার মূল্যায়ন/আনুমানিক হিসাব)

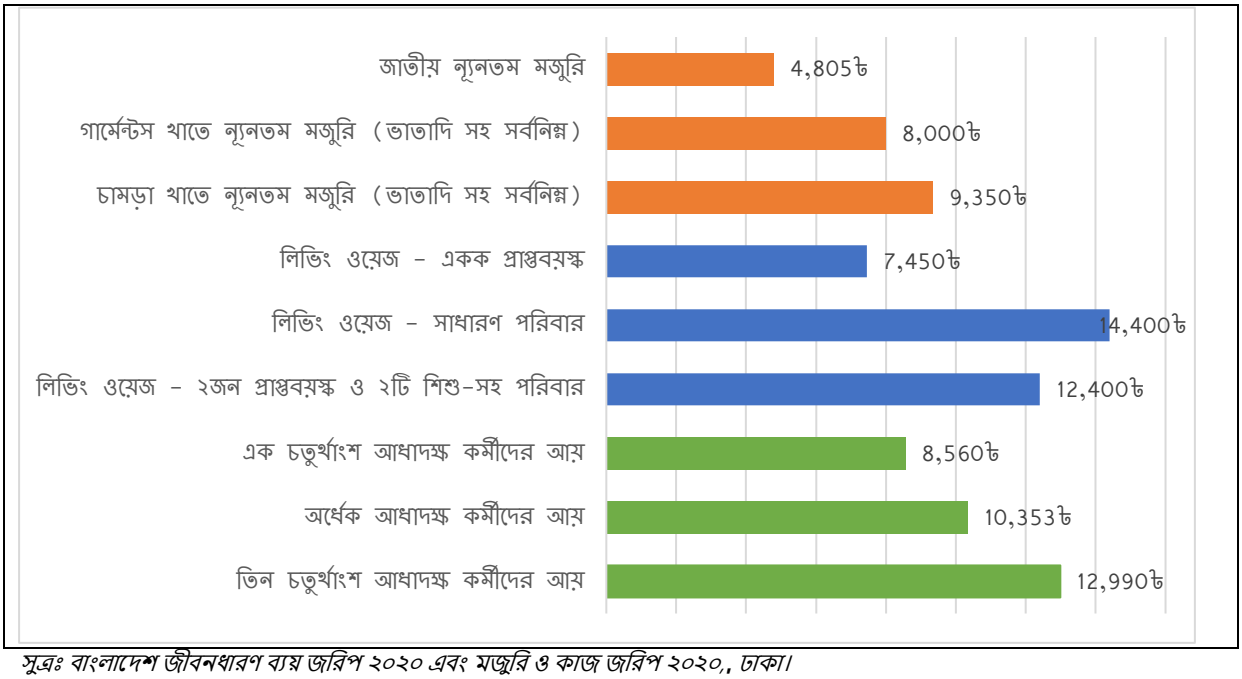

সূত্রঃ বাংলাদেশ জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০ এবং মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০, ঢাকা।

সিলেট অঞ্চল

জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০ এর ভিত্তিতে সিলেট বিভাগে একটি পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল ব্যয় বহন করতে স্বামী-স্ত্রী দুজনকে একত্রে আয় করতে হবে সর্বমোট ২৬,৫১৭ টাকা (সারণি ৮)। সুতরাং একটি সাধারণ পরিবারের পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জীবনধারণ উপযোগী মজুরি ১৬,৮০০ টাকা।

সারণি ৮: সিলেটের জন্য জীবনধারণ ব্যয় ও জীবনধারণ উপযোগী মজুরি পরিমাপ (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০)

ব্যয়ের খাত	সাধারণ পরিবার	আদর্শ পরিবার	একজন-প্রাপ্তবয়স্ক
খাদ্য	১,২৯৩১ – ১,৪২৭২	১২,৬১৬ – ১৩,৯২৪	৩,১৫৪ – ৩,৪৮১
আবাসন	৮,১৭০ – ৯,৫৮০	৮,১৭০ – ৯,৫৮০	৩,০০০ – ৩,১৮০
যাতায়াত	১,৬৬৬ – ২,২০০	১,৬৬৬ – ২,২০০	৮৩৩ – ১,১০০
স্বাস্থ্যসেবা	৪৪৭ – ৭৬৭	৪৩৬ – ৭৪৮	১০৯ – ১৮৭
শিক্ষা	৯৬৮ – ১,২১২	৯২২ – ১,১৫৪	০
কাপড়	৭৯১ – ১,১১৫	৭৭২ – ১,০৮৮	১৯৩ – ২৭২
পানি	২০৫ – ২৫৮	২০০ – ২৫২	৫০ – ৬৩
ফোন	৭৬ – ১১৬	৭৬ – ১১৬	৩৮ – ৫৮
অন্যান্য	১,২৬৩ – ১,৪৭৬	১,২৪৩ – ১,৪৫৩	৩৬৯ – ৪১৭
সর্বমোট ব্যয়	২৬,৫১৭ – ৩০,৯৯৬	২৬,১০১ – ৩০,৫১৫	৭,৭৪৬ – ৮,৭৫৮
নেট লিভিং ওয়েজ	১৬,৭৮৩ – ১৯,৬১৮	১৪,৫০১ – ১৬,৯৫৩	৭,৭৪৬ – ৮,৭৫৮
গ্রস লিভিং ওয়েজ (মার্জিত)	১৬,৮০০ – ১৯,৬০০	১৪,৫০০ – ১৭,০০০	৭,৭৫০ – ৮,৭৬০

সূত্রঃ বাংলাদেশ জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০, সিলেট।

চিত্র ১৩ থেকে দেখা যায়, সিলেট বিভাগের ২৫তম, ৫০তম এবং ৭৫তম আধা-দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে কারোর আয়ই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জীবনধারণ উপযোগী ব্যয় নির্বাহের জন্য যথেষ্ট নয়, একটি

(২+২) আদর্শ পরিবার বা সাধারণ পরিবার তো আরও দূরের কথা। তবে এক্ষেত্রে এ বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত যে, এই উপার্জনগুলো মূলত চা বাগান এবং এস্টেটগুলোয় শ্রমিকদের মজুরির ভিত্তিতে করা হয়, যেখানে নিয়োগকর্তারা শ্রমিকদের আবাসন ও খাবারের মতো অ-আর্থিক মৌলিক সুবিধাগুলো বিনা মূল্যে সরবরাহ করে।

চিত্র ১৩: সিলেটে জীবনধারণ উপযোগী মজুরি (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, নিম্নসীমার মূল্যায়ন/আনুমানিক হিসাব)

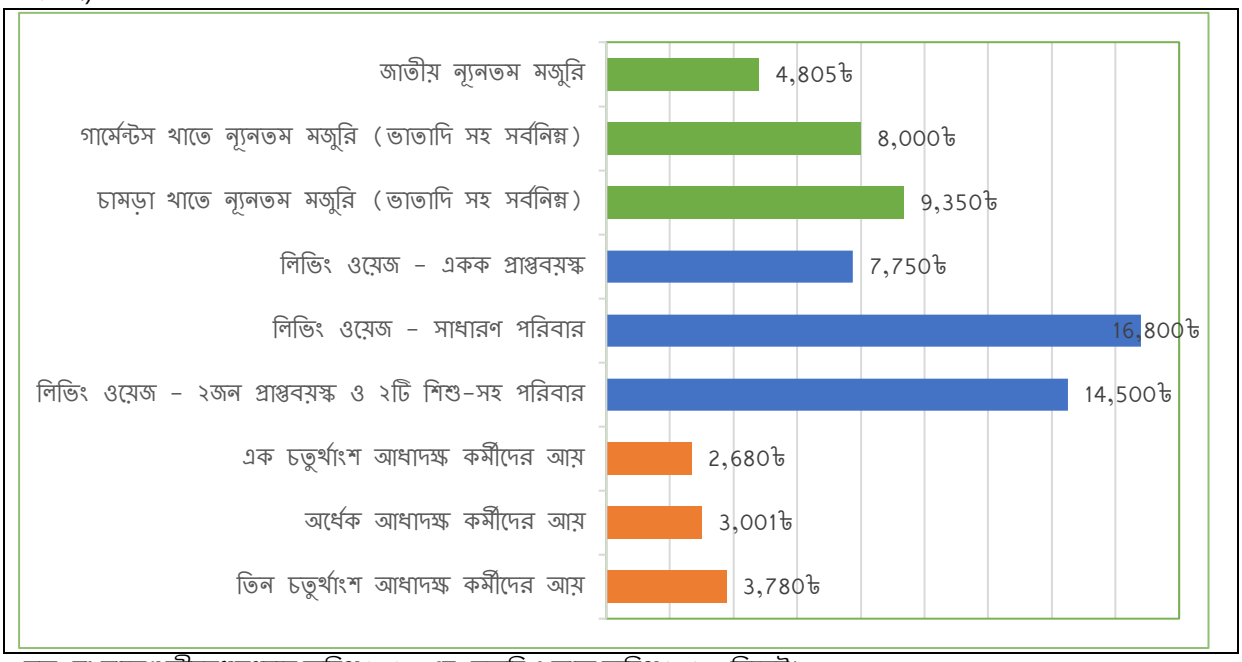

সূত্রঃ বাংলাদেশ জীবনধারণব্যয় জরিপ ২০২০ এবং মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০, সিলেট।

রাজশাহী অঞ্চল

অন্যান্য মাধ্যম থেকে ওয়েজিন্ডিকেটর ইতিমধ্যে চতুর্থ অঞ্চল রাজশাহীর জন্য জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০ এর উপাত্ত সংগ্রহ করেছিল। এর ভিত্তিতে রাজশাহীতে একটি পরিবারের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল ব্যয় নির্বাহ করতে পিতা-মাতা দুইজনকেই একত্রে সর্বমোট ২১,৯৫৪ টাকা আয় করতে হয় (সারণি ৯)। সুতরাং একটি সাধারণ পরিবারে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জীবনধারণ উপযোগী ব্যয় ১৩,৯০০ টাকা। যেহেতু এই অঞ্চলটি *Decent Wage Bangladesh* প্রকল্পের আওতাভুক্ত ছিল না, তাই সেখানে বাংলাদেশ *মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০* পরিচালনা করা হয়নি।

সারণি ৯: রাজশাহী অঞ্চলের জন্য জীবনধারণ ব্যয় ও জীবনধারণ উপযোগী মজুরি পরিমাপ (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২০)

ব্যয়ের খাত	সাধারণ পরিবার	আদর্শ পরিবার	একজন-প্রাপ্তবয়স্ক
খাদ্য খরচ	৮,৯৩৪ – ১০,৩৩৬	৮,৭১৬ – ১০,০৮৪	২,১৭৯ – ২,৫২১
আবাসন খরচ	৮,৯৮০ – ১০,০০০	৮,৯৮০ – ১০,০০০	৪,০০০ – ৪,২৬০
যাতায়াত খরচ	১,৫০০ – ২,০০০	১,৫০০ – ২,০০০	৭৫০ – ১,০০০
স্বাস্থ্যসেবা খরচ	২০৫ – ২৩৮	২০০ – ২৩২	৫০ – ৫৮
শিক্ষা খরচ	৭৮৮ – ১,৭৫১	৭৫০ – ১,৬৬৮	০
কাপড় খরচ	২৫৮ – ৪৬৩	২৫২ – ৪৫২	৬৩ – ১১৩
পানি খরচ	১৬৮ – ২১৩	১৬৪ – ২০৮	৪১ – ৫২
ফোন খরচ	৭৬ – ১১৬	৭৬ – ১১৬	৩৮ – ৫৮
অন্যান্য খরচ	১,০৪৫ – ১,২৫৬	১,০৩২ – ১,২৩৮	৩৫৬ – ৪০৩
সর্বমোট খরচ	২১,৯৫৪ – ২৬,৩৭৪	২১,৬৭০ – ২৫,৯৯৮	৭,৪৭৭ – ৮,৪৬৫
নেট লিভিং ওয়েজ	১৩,৮৯৫ – ১৬,৬৯২	১২,০৩৯ – ১৪,৪৪৩	৭,৪৭৭ – ৮,৪৬৫
গ্রস লিভিং ওয়েজ (মার্জিত)	১৩,৯০০ – ১৬,৭০০	১২,০০০ – ১৪,৪০০	৭,৪৮০ – ৮,৪৭০

সুত্রঃ বাংলাদেশ জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০, রাজশাহী।

চিত্র ১৪ থেকে দেখা যাচ্ছে, জাতীয় নিম্নতম মজুরি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জীবনধারণ উপযোগী মজুরির তুলনায় যথেষ্ট নয় অর্থাৎ কম, একটি (২+২) আদর্শ পরিবার বা সাধারণ পরিবার তো দূরের কথা। তৈরি পোশাক এবং চামড়া শিল্পের নিম্নতম মজুরি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জীবণধারণ উপযোগী মজুরির তুলনায় যথেষ্ট তবে একটি (২+২ আদর্শ) পরিবার বা সাধারণ পরিবারের জীবণধারণ উপযোগী মজুরির তুলনায় যথেষ্ট নয় অর্থাৎ কম।

চিত্র ১৪: রাজশাহীতে জীবণধারণ উপযোগী মজুরি (বাংলাদেশি টাকায় মাসিক হার, নিম্নসীমারমূল্যায়ন/আনুমানিক হিসাব)

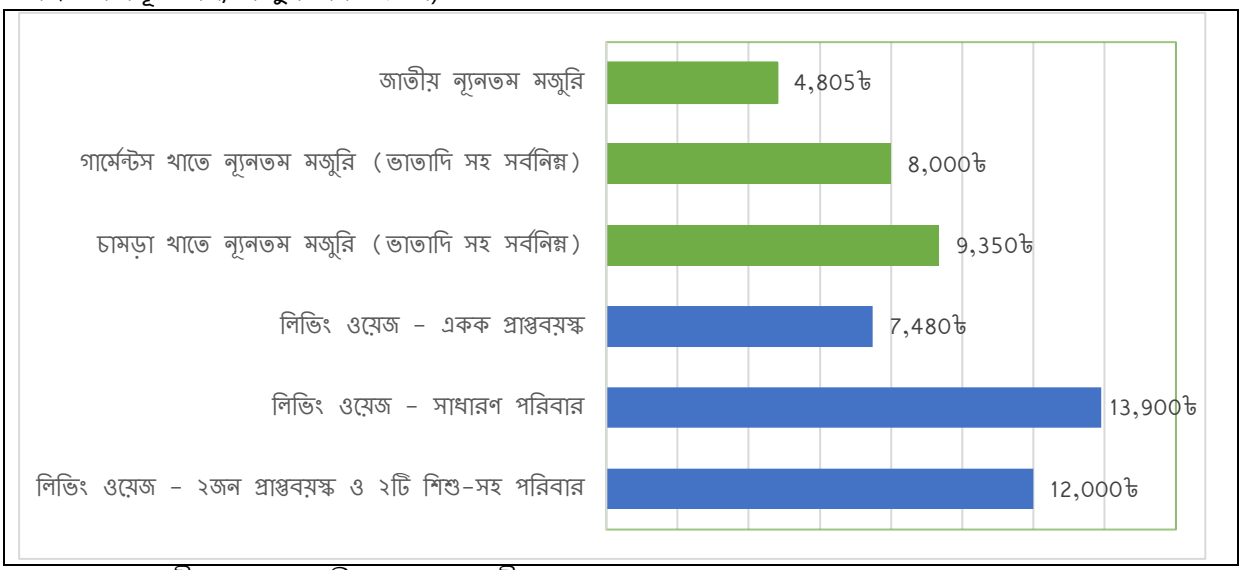

সুত্রঃ বাংলাদেশ জীবনধারণ ব্যয় জরিপ ২০২০, রাজশাহী।

৫। পেশা ও শিক্ষা

বক্স ২: বাংলাদেশ মজুরি ও কাজ জরিপ পদ্ধতি

জরিপে কর্মীদেরকে তাদের পেশার পদবী কি সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। বিআইডিএস এবং ওয়েজইন্ডিকেটরের মধ্যেকার বিস্তারিত আলোচনার ভিত্তিতে প্রতি সেক্টরের জন্য সর্বাধিক প্রচলিত কাজের পেশাগুলির একটি পূর্বনির্ধারিত তালিকা তৈরি করা হয়। এই তালিকায় নির্মাণ শিল্পের ২৬টি, চা শিল্পের ১০টি, তৈরি পোশাক শিল্পের ২১টি এবং চামড়া ও পাদুকা শিল্পের ২৬টি পেশা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যদি কোনো পেশার নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নির্ধারিত পেশা বহির্ভূত হয় তাহলে 'অন্যান্য' ক্যাটাগরির পাশে টিক চিহ্ন বসানো হয়। উত্তরদাতার সর্বোচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়েও জরিপে একটি প্রশ্ন ছিল। এখানে সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীকে "কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই" থেকে শুরু করে "স্নাতকোত্তর" পর্যন্ত ১৮টি বিকল্পের মধ্য থেকে শিক্ষার স্তর নির্বাচন করতে হতো। এই অধ্যায়ে জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

পেশা

বিশ জন কর্মী বাদে সকল কর্মীর চাকুরির পেশা তালিকাতে চিহ্নিত করা হয়। যে ২০ জনের পেশা তালিকায় ছিল না তাদেরকে "অন্যান্য" ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চারটি পেশা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়: চা বাগান ও এস্টেটগুলিতে পাতা সংগ্রহকারী (২২৭), নির্মাণ খাতে সহকারী (১৭৩), তৈরি পোশাক খাতে সেলাই অপারেটর (১২০) এবং চামড়া ও পাদুকা শিল্পে মেশিন অপারেটর-নিটিং (৪০৮)। চিত্র ১৫ থেকে দেখা যায় যে, প্রতি দশ জন শ্রমিকের মধ্যে নির্মাণ খাতের চার জন সহকারী, চা বাগান ও এস্টেটের প্রায় ছয় জন পাতা সংগ্রহকারী, তৈরি পোশাকে ছয়জন মেশিন অপারেটর, এবং চামড়া ও পাদুকাতে দশজনে প্রায় চারজন সেলাই অপারেটর।

চিত্র ১৫: খাত অনুযায়ী *পেশার শ্রেণীভাগের* বিন্যাস

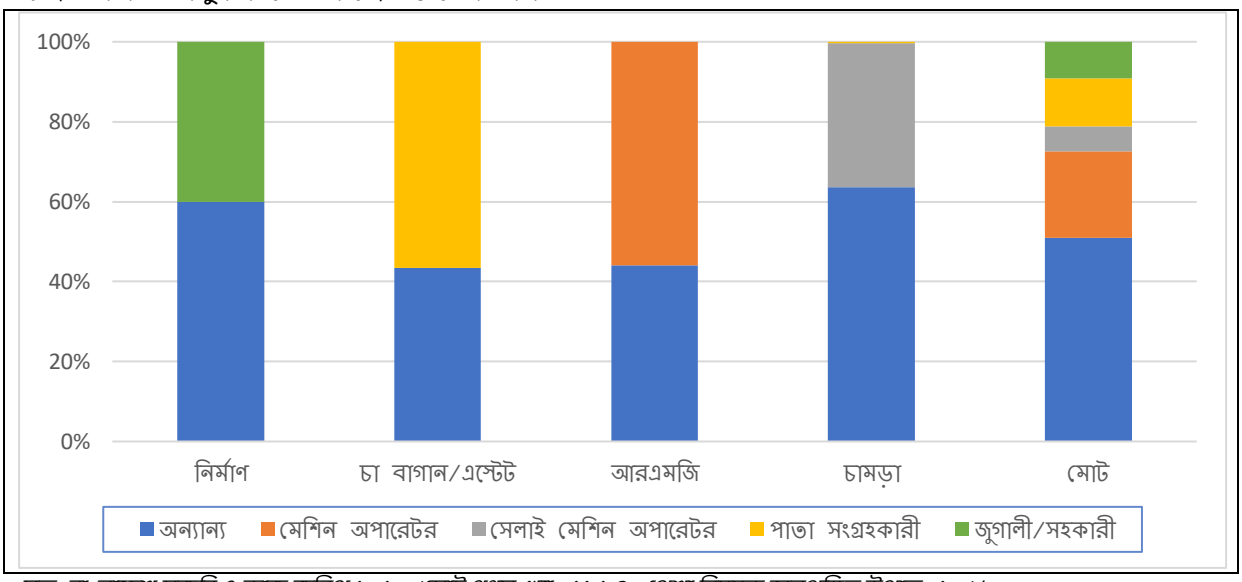

সূত্র: বাংলাদেশ মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ (মোট গণসংখ্যা= ১৮৯৪, পেশা বিষয়ক অনুপস্থিত উপাত্ত= ২০)।

পেশাগুলোর পদবী কোডিংয়ের ক্ষেত্রে আইএলওর ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অকুপেশনাল ক্লাসিফিকেশন ।SCO08 ব্যবহার করা হয়েছে। ।SCO08,তে প্রয়োজনীয় দক্ষতার স্তরের ভিত্তিতে পেশার শ্রেণীকরণ করা হয়। দক্ষতার ভিত্তিতে সকল পেশাকে চারটি শ্রেণিভাগ করা হয়েছে: অদক্ষ কর্মী, আধাদক্ষ কর্মী, দক্ষ কর্মী এবং অতি দক্ষ কর্মী। জরিপে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের বেশিরভাগ আধা-দক্ষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত (৭১ শতাংশ), এর পরেই রয়েছে অদক্ষ কর্মী (২৮ শতাংশ) ক্যাটাগরি। জরিপে অল্প কিছু সংখ্যক দক্ষ ও অতি দক্ষ কর্মীর সাক্ষাৎকার নেয়া হয়।

খুব কম সংখ্যক শ্রমিকই বলেছে যে তারা তত্ত্বাবধানমূলক (সুপারভাইজরী) জাতীয় কাজ করে। নির্মাণ খাতে বেশি সংখ্যায় লক্ষ করা গেলেও চা বাগান ও এস্টেটগুলিতে খুব কম কর্মীকেই তত্ত্বাবধানমূলক কাজ করতে দেখা গিয়েছে। এই খাতগুলিতে তত্ত্বাবধায়ক পদবীর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, মহিলা কর্মীদের চেয়ে পুরুষ কর্মীরা এই পদে কাজ করার কথা বেশি উল্লেখ করেছে এবং অন্যান্য বয়স গ্রুপের চেয়ে ৩০-৪০ বয়স গ্রুপের কর্মীরা তত্ত্বাবধায়ক পদে কাজ করার কথা বেশি উল্লেখ করেছে।

শিক্ষা

জরিপে দেখা গেছে, প্রতি ১০ জন শ্রমিকে ২ জনের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই বা কেবল প্রথম শ্রেণী সম্পন্ন করেছে। প্রতি ছয়জনের মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এবং প্রতি ছয়জনে একজন পঞ্চম শ্রেণী পাস। অর্থাৎ চারটি শিল্পখাতের কর্মীদের ৫০ শতাংশ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করেছে অর্থাৎ ৫ম শ্রেণী উত্তীর্ণ। বাকি ৫০ শতাংশ প্রাথমিক স্তরের উপরের স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। প্রতি ছয়জন শ্রমিকের মধ্যে দু'জনের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম অথবা ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এবং বাকীরা আরও বেশি বছর ধরে শিক্ষা লাভ করেছে।

শিক্ষার স্তরের দিক দিয়ে মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে (চিত্র-১৬)। যে সকল কর্মীর কোনো প্রকার শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপক লিঙ্গীয় পার্থক্য অর্থাৎ নারী-পুরুষ প্রভেদ লক্ষ করা যায়। নারীদের ক্ষেত্রে প্রতি চার জনে একের অধিক নারী কর্মীর এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রতি দশ জনে এক জনেরও কম নারী কর্মীর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। বেশির ভাগ নারী কর্মীই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, যেখানে পুরুষ কর্মীদের অনেকেই ৮ম, ৯ম শ্রেণী বা তদূর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা লাভ করেছে।

চিত্র ১৬:শিক্ষার স্তর ও লিঙ্গ ভেদে শ্রমিকদের শতকরা হার

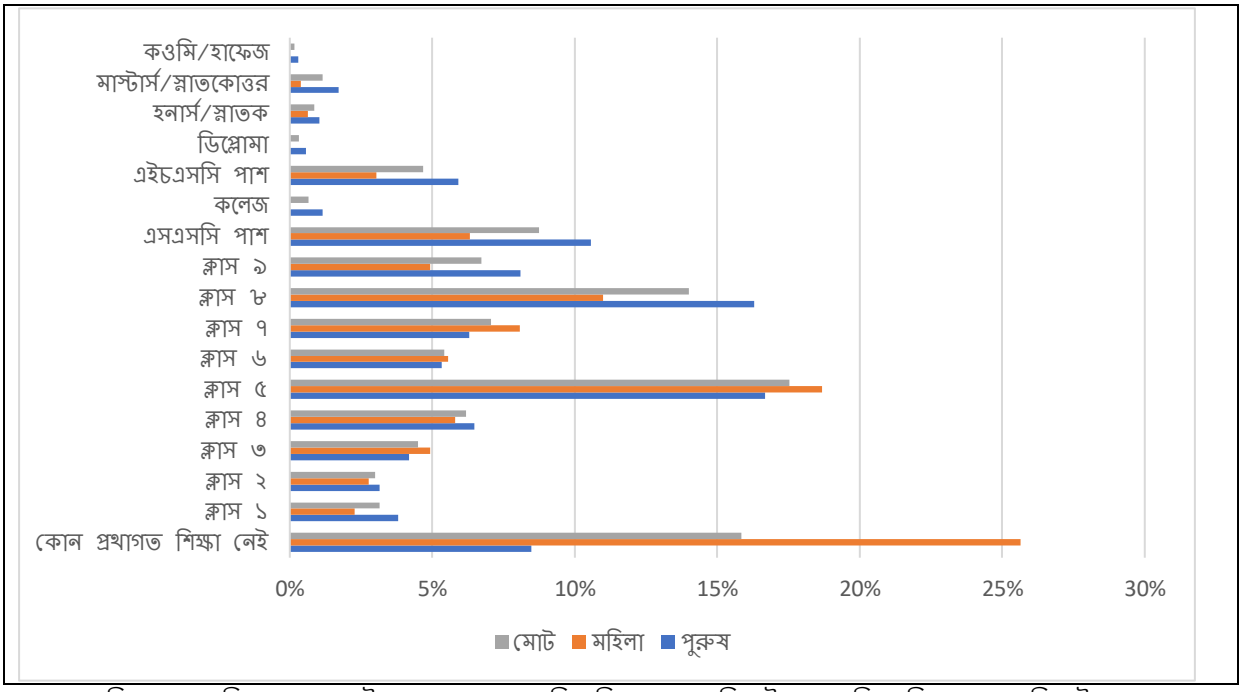

সূত্র: মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ (মোট গণসংখ্যা= ১৮৯৪, লিঙ্গ বিষয়ক অনুপস্থিত উপাত্ত ৬, শিক্ষা বিষয়ক অনুপস্থিত উপাত্ত ০)

চা বাগান ও এস্টেটগুলোতে নিয়োজিত কর্মীদের অর্ধেকের বেশির কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই, যেখানে অন্য তিনটি খাতের কর্মীদের মাত্র এক অতি ক্ষুদ্র সংখ্যকের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই (চিত্র ১৭)। নির্মাণ খাতের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক কর্মী ৫ম শ্রেণী উত্তীর্ণ, যেখানে তৈরি পোশাক খাতে এক-তৃতীয়াংশ ও টেক্সটাইলে এক-চতুর্থাংশ ৫ম শ্রেণী পাস। চামড়া ও পাদুকা শিল্পে প্রায় অর্ধেক শ্রমিক ৯ম শ্রেণী উত্তীর্ণ। অন্য তিনটি খাতের চেয়ে চামড়া খাতে এসএসসি বা এইচএসসি বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রীধারী কর্মীর হার সবচেয়ে বেশি।

কেবল কয়েক বছরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এটাই বোঝায় যে কর্মীরা খুব কম বয়সে কর্মজীবন শুরু করে বা কর্মে যোগদান করে। পুরুষ কর্মীদের ক্ষেত্রে এটি একটি বাস্তব সত্য। নির্মাণ খাতের কর্মীরা অন্যান্য খাতের কর্মীদের তুলনায় আরো অল্প বয়সে চাকুরী বা কর্মে প্রবেশ করে: বেশিরভাগই ১৭ বছর বয়সে। নারী কর্মী অধ্যুষিত চা খাতে চিত্রটা একটু আলাদা। এখানে চাকুরীতে প্রথম যোগদানের গড় বয়স ২০ বছর। তাদের প্রায় অর্ধেকই ২০ থেকে ৩০ এমনকি অনেকে ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সেও কর্মে প্রবেশ করেছে। সুতরাং তাদের এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মী পরিবার শুরু করার পর বা নিজেদের ফার্মে কাজ করার পরে বেতনভুক্ত চাকরিতে প্রবেশ করে। তৈরি পোশাক খাতে প্রতি দশ জন কর্মীর মধ্যে ছয়জন ১৮ বছর বা তার চেয়ে কম বয়সে প্রথম চাকরিতে প্রবেশ করে, এবং প্রতি দশ জনে চার জন বয়স বিশের কোঠায় থাকতে চাকরিতে প্রবেশ করে। চামড়া ও পাদুকা শিল্পে খুব কম কর্মীই ১৫ বছর বয়সের আগে প্রথম চাকরিতে প্রবেশ করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মী ১৫-১৮ বছর বয়সে চাকরিতে প্রবেশ করে। বাকি কর্মীরা ১৯ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে প্রথম চাকরিতে প্রবেশ করে অর্থাৎ কর্মজীবন শুরু করে।

চিত্র ১৭: চার ধরনের শিক্ষা স্তরে শ্রমিকের শতকরা হার (খাত অনুসারে)

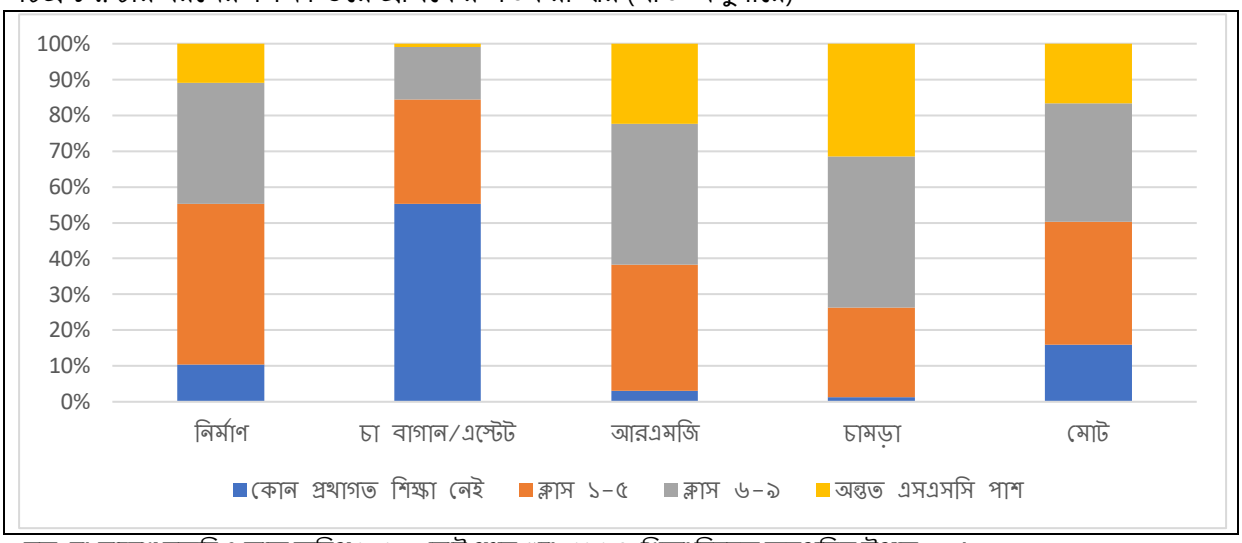

সূত্র: বাংলাদেশ মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ (মোট গণসংখ্যা= ১৮৯৪, শিক্ষা বিষয়ক অনুপস্থিত উপাত্ত= ০)।

৬। কর্মঘণ্টা

বক্স ৩: বাংলাদেশ মজুরি ও কাজ জরিপ - গবেষণা পদ্ধতি

জরিপে কর্মঘণ্টা সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রশ্ন অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এসব প্রশ্নের মাধ্যমে সাপ্তাহিক কার্যদিবসের সংখ্যা, সাপ্তাহিক চুক্তিবদ্ধ ঘণ্টা, সাপ্তাহিক স্বাভাবিক কর্মঘণ্টা এবং বেতনসহ বার্ষিক ছুটি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে কর্মঘণ্টা সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

চুক্তিবদ্ধ কর্মঘন্টা

জরিপে অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল শ্রমিকেরই চুক্তিবদ্ধ কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করা আছে। অর্ধেকের সামান্য বেশি শ্রমিকের কর্মঘণ্টা সম্পর্কিত লিখিত চুক্তিপত্র থাকলেও বাকিদের ক্ষেত্রে তা নেই অর্থাৎ মৌখিক চুক্তি রয়েছে। অতি নগণ্য সংখ্যক শ্রমিকের কোনো চুক্তিবদ্ধ কর্মঘণ্টা নেই। যেসব শ্রমিক মধ্যস্ততাকারীর মাধ্যমে নিযুক্ত হয়েছে তাদের কর্মঘণ্টা বিষয়ক লিখিত চুক্তি রয়েছে এবং চুক্তিবিহীন শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কর্মঘণ্টা বিষয়ে মৌখিক চুক্তি রয়েছে। চুক্তিবদ্ধ কর্মঘণ্টা বিহীন শ্রমিকদের কোনো নিয়োগ চুক্তিপত্র নেই।

সাপ্তাহিক কার্যদিবস

জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকরা সপ্তাহে গড়ে ৬.১ দিন কাজ করে। প্রতি ১০ জন শ্রমিকে ৯ জনই সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করে (চিত্র ১৮ দেখুন)। নারী শ্রমিকদের চেয়ে পুরুষ শ্রমিকরা বেশি সংখ্যায় সপ্তাহে ৭ দিন কাজ করে থাকে (পুরুষ শ্রমিক: ১৩ শতাংশ, নারী শ্রমিক: ৩ শতাংশ)। চা বাগানে সপ্তাহে সাধারণত ৬ দিন কাজ করা হয় কিন্তু দেখা গেছে প্রতি ১০ জনে প্রায় ১ জন সপ্তাহে ৭ দিনই কাজ করে থাকে। তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতে প্রায় সকল শ্রমিক সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করে থাকে। নির্মাণখাতে সাপ্তাহিক কার্যদিবসের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থ্যাৎ ৭দিন। প্রতি ১০ জন শ্রমিকের ২ জনই সপ্তাহে ৭ দিন কাজ করে।

চিত্র ১৮: সাপ্তাহিক কার্যদিবস, খাত ও অঞ্চল ভেদে শ্রমিকের শতকরা হার

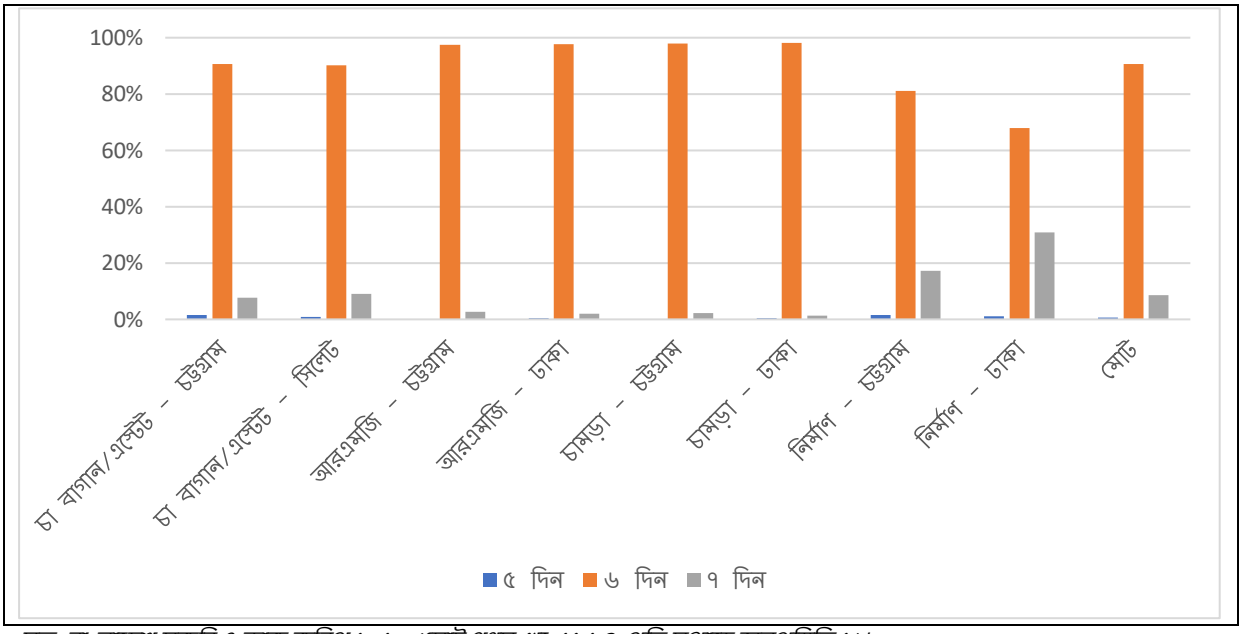

সূত্র: বাংলাদেশ মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ (মোট গণসংখ্যা=১৮৯৪, প্রতি সপ্তাহে অনুপস্থিতি ২)।

সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা

আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা কাজ করা হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের গড় চুক্তিভিত্তিক সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা কিছুটা বেশি, যা সপ্তাহে ৪৯.৬ ঘন্টা। আর এ বেশি হওয়ার কারণ হলো নির্মাণখাত। কেননা দেখা গেছে চট্রগ্রাম ও ঢাকায় নির্মাণ শ্রমিকদের চুক্তিবদ্ধ গড় সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা যথাক্রমে ৫২.৪ ও ৫৩.৫ ঘণ্টা। পক্ষান্তরে চট্টগ্রামের চা বাগান ও এস্টেটগুলোতে চুক্তিভিত্তিক গড় সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা সবচেয়ে কম, সপ্তাহে ৪৬.৯ ঘণ্টা।

শ্রমিকরা চুক্তি ভিত্তিক কর্মঘণ্টা অনুযায়ী কাজ করে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে প্রতি ১০ জনে ৭ জন বলেছে তারা তারা চুক্তি মোতাবেক কাজ করে থাকে। এজন্য তাদেরকে ওভারটাইম অর্থাৎ অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয় না। আবার নির্মাণখাতে সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা দীর্ঘ হলেও এই খাতের শ্রমিকদের ওভারটাইম কাজ তেমন ভাবে ধরা হয় না। তৈরি পোশাক খাতে বিশেষ করে চট্টগ্রামেঅতিরিক্ত কাজের সময় লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। প্রতি ১০ জনে ৯ জনেরও বেশি শ্রমিক জরিপে উল্লেখ করে যে তারা সাধারণত চুক্তিবদ্ধ নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় কাজ করে থাকে। যারা চুক্তি বহির্ভূত অতিরিক্ত ঘণ্টা কাজ করে, তাদের গড় সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা ৫৭.৯ ঘন্টা। চট্টগ্রামে তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতে সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক কর্মঘণ্টা পরিলক্ষিত হয়, সপ্তাহে প্রায় ৬০ ঘণ্টা ।

বার্ষিক কর্মঘন্টা

জরিপে শ্রমিকদের বাৎসরিক কর্মঘণ্টা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি কারণ বেশিরভাগ শ্রমিকের পক্ষে এ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুব কঠিন বোধ হতো। বাংলাদেশ ডিসেন্ট ওয়ার্ক চেক ২০২০[১৫] অনুসারে একজন প্রাপ্তবয়স্ক কর্মী প্রতি ১৮ কর্মদিবস কাজের জন্য মজুরিসহ ১ দিন ছুটি পাবার অধিকারী হয়ে থাকে তবে চা বাগানের ক্ষেত্রে তা প্রতি ২২ দিন কাজের জন্য মজুরিসহ ১ দিন ।

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মজুরিসহ বার্ষিক ছুটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে প্রতি ১০ জনে ৭ জন শ্রমিক বলেছে তারা এই ছুটি নিতে পারছে, এবং পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে নারী শ্রমিকরা ছুটি নেয়ার কথা বেশি উল্লেখ করেছে (চিত্র ১৯ দেখুন) তবে ২০ বছরের কম বয়সী শ্রমিকরা কম উল্লেখ করেছে। নির্মাণখাতের শ্রমিকদের বক্তব্য অনুযায়ী সে খাতে এই ছুটি নেই বললেই চলে, কিন্তু বাকি তিনটি খাতে প্রতি ১০ জন শ্রমিকের ৮ জনই এই ছুটি নেয়ার সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করে। চুক্তিবিহীন শ্রমিকদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোগ ও ক্ষুদাকৃতির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকরা খুব কম সময়ই মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি নিতে পারে।

চিত্র ১৯: বার্ষিক ছুটি (বেতনসহ) ভোগকারী শ্রমিকদের শতকরা হার (লিঙ্গ, বয়স, খাত, চুক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে)

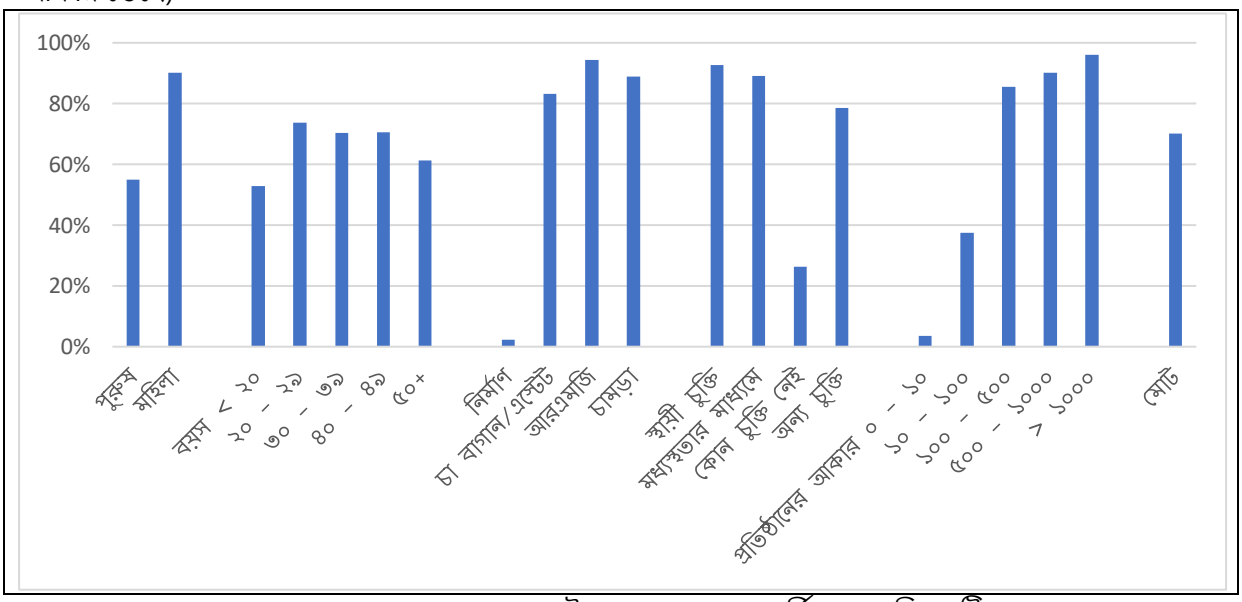

সূত্র: *Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা=১৮৯৪, বার্ষিক অনুপস্থিত ছুটি= ১)*

[১৫] দেখুন https://wageindicator.org/documents/decentworkcheck/asia/bangladesh-english.pdf

৭। কর্মনিয়োগের বৈশিষ্ট্য

বক্স ৪: বাংলাদেশ মজুরি ও কাজ জরিপ - গবেষণা পদ্ধতি

জরিপে নিয়োগ চুক্তি বা কর্মচুক্তি, কাজের অভিজ্ঞতা এবং কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অধ্যায়ে এসব বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

চার ধরনের নিয়োগচুক্তি

জরিপে চার ধরনেরর নিয়োগ চুক্তি চিহ্নিত করা হয় (চিত্র ২০ দেখুন)। দেখা গেছে, প্রতি ১০ জন শ্রমিকের মাঝে ৪ জনের স্থায়ী চুক্তি রয়েছে, ২ জনের অধিকের মধ্যস্ততার মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ হয়, ৩ জনের বেশির কোনো চুক্তি নেই, এবং অবশিষ্ট শ্রমিকদের অন্য ধরনের চুক্তি রয়েছে। বিভিন্ন শিল্পখাতের চুক্তিরমধ্যে বেশ তারতম্য রয়েছে। এছাড়া অঞ্চলভেদেও সামান্য তারতম্য রয়েছে (চিত্র ২০)। নির্মাণ খাতের প্রায় সকল শ্রমিকের কোনো ধরনের চুক্তি নেই, তবে চামড়া খাতে বিশেষ করে চট্টগ্রামের শ্রমিকদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্টের স্থায়ী চুক্তি রয়েছে। চট্রগ্রামে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের অধিকাংশেরই স্থায়ী চুক্তি রয়েছে যেখানে ঢাকায় প্রতি ১০ জনে মাত্র ৪ জনের স্থায়ী চুক্তি রয়েছে। ঢাকায় তৈরি পোশাক শ্রমিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠই মধ্যস্ততাকারীর মাধ্যমে কর্মে নিযুক্ত হয়েছে। চট্টগ্রামে চা বাগান ও এস্টেটগুলোর অধিকাংশ শ্রমিকের কোনো চুক্তি নেই যেখানে সিলেটে প্রায় সকল শ্রমিকেরই স্থায়ী চুক্তি রয়েছে।

চিত্র ২০: খাত ও অঞ্চল ভেদে চুক্তির বিন্যাস

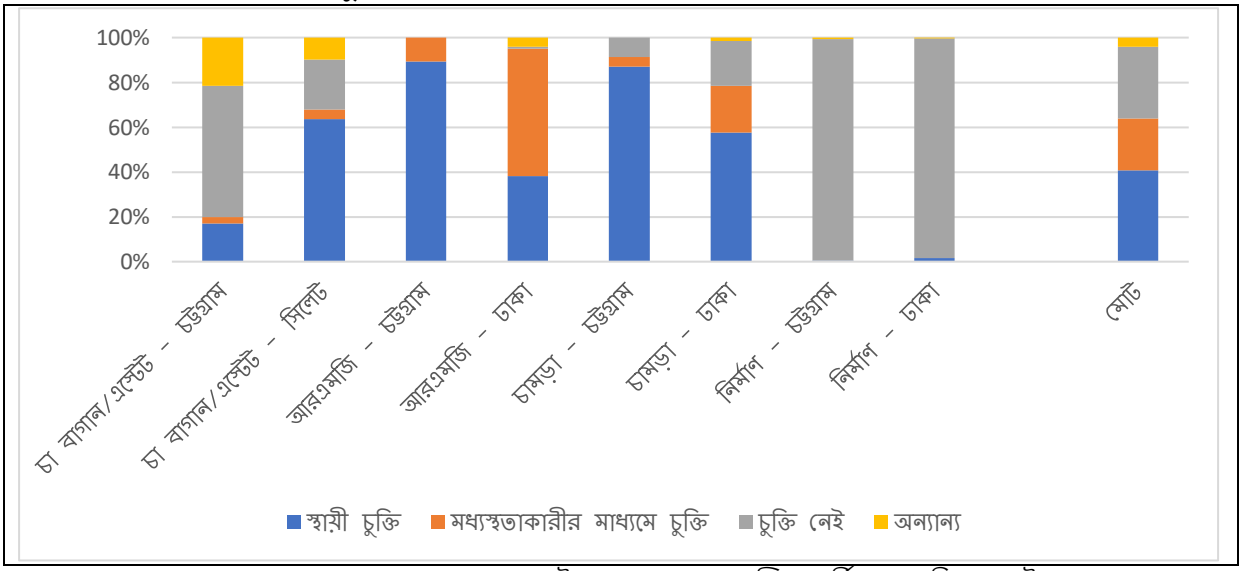

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা= ১৮৯৪, চুক্তি সম্পর্কিত অনুপস্থিত তথ্য/উপাত্ত= ০)

লিঙ্গ, বয়স, খাত ও প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে নিয়োগ/কর্মসংস্থান চুক্তি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরগুলোর বিন্যাস/বিভাজন চিত্র ২১ এ দেখানো হয়েছে। । চিত্রটি থেকে দেখা যাচ্ছে, যেখানে পুরুষ শ্রমিকদের অধিকাংশেরই কোনো নিয়োগ চুক্তি নেই, সেখানে পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে নারী শ্রমিকের স্থায়ী চুক্তি

বেশি। পুরনো শ্রমিকদের প্রায় সবারইই স্থায়ী চুক্তি রয়েছে। নির্মাণখাতে প্রায় কোনো শ্রমিকেরই চুক্তি নেই, যেখানে চা বাগান/এস্টেট, তৈরি পোশাক খাত এবং চামড়া খাতে প্রতি ১০ জনে ৪ থেকে ৬ জন শ্রমিকের স্থায়ী চুক্তি রয়েছে। চা বাগান ও এস্টেটে প্রতি ১০ জনে ৩ জনের কোনোচুক্তি নেই কিন্তু তৈরি পোশাক খাতে মধ্যস্ততার মাধ্যমে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ একটি সাধারণ বিষয়। প্রতিষ্ঠানের আকার ভিত্তিক বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, যেসব প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনের কম শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সাধারণত কোনো নিয়োগ চুক্তি থাকে না এবং যে সব প্রতিষ্ঠানে ১০০ জনের বেশি শ্রমিক রয়েছে সেগুলোর কর্মীদের প্রায় অর্ধেকের স্থায়ী চুক্তি রয়েছে।

কাজের অভিজ্ঞতার সময়কাল

জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের গড়ে ১১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রতি ১০ জনে ৬ জনের ১০ বছরের কম সময় এবং প্রায় ৩ জনের ১০ থেকে ২০ বছরের কর্ম-অভিজ্ঞতা রয়েছে বাকি শ্রমিকরা ২০ বছরের চেয়ে বেশি সময় ধরে কাজ করছে। পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে নারী শ্রমিকদের কাজের অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম। কাজের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি চা বাগান ও এস্টেটের কর্মীদের (গড়ে ১৭ বছর) আর সবচেয়ে কম তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের (গড়ে ৮ বছর)।

জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে তারা তাদের বর্তমান কর্মস্থলে পদোন্নতি পেয়েছিল কিনা। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক শ্রমিক জানিয়েছে যে তারা বর্তমান কর্মস্থলে পদোন্নতি পেয়েছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, অধিক অভিজ্ঞতাধারী শ্রমিকরাই বেশিরভাগ সময় পদোন্নতি পেয়ে থাকে। চা বাগান ও এস্টেট এবং নির্মাণখাতের চেয়ে তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতের শ্রমিকরা বেশি হারে পদোন্নতি পেয়ে থাকে। নারী শ্রমিকদের তুলনায় পুরুষ শ্রমিকদের পদোন্নতির হার কিছুটা বেশি।

চিত্র ২১: লিঙ্গ, বয়স, খাত ও প্রতিষ্ঠানের আকার অনুসারে চুক্তির বিন্যাস

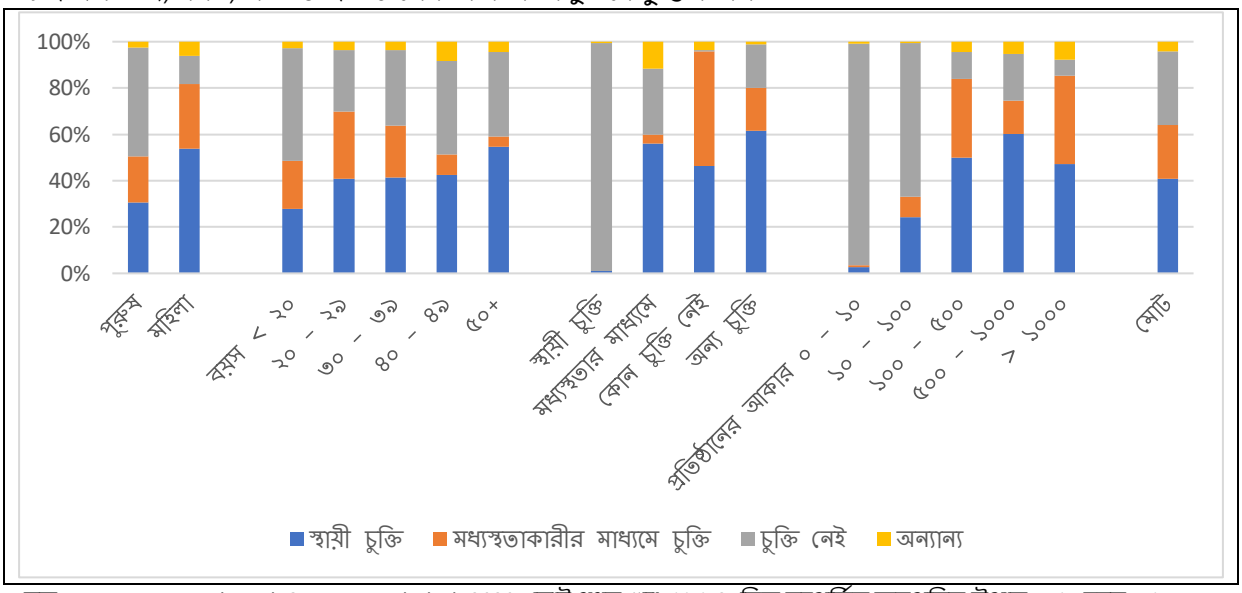

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা= ১৮৯৪, লিঙ্গ সম্পর্কিত অনুপস্থিত উপাত্ত = ৬, বয়স = ১০, প্রতিষ্ঠানের আকার = ২)।

৮। চার খাতে কোভিড-১৯ এর অভিজ্ঞতা

বক্স ৫: কোভিড-১৯ এর কারণে কাজে অনুপস্থিতি বিষয়ক প্রশ্ন

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারী আঘাত হানায় *Decent Wage Bangladesh phase 1* প্রকল্পের কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। "*Wages and Work Survey 2020*" এর কাজ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হয়, এতে শ্রমিকরা মহামারীর কারণে কিভাবে ও কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা জানা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণে জরিপে কাজে অনুপস্থিত থাকা, অনুপস্থিত থাকার কারণ এবং শ্রমিকরা কীভাবে তাদের আয়ে সাধিত ক্ষতি পুষিয়েছে সে সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন জরিপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অধিকন্তু কর্মক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধা বিষয়েও কিছু প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কোভিড-১৯ এর কারণে কাজে অনুপস্থিতি

মহামারীর প্রথম দিকে যখন সরকার সকল কারখানাতে সাধারণ লকডাউন ঘোষণ করে, তখন কাজে অনুপস্থিত থাকা শ্রমিকের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ। প্রতি ১০ জন শ্রমিকের মাঝে প্রায় ৮ জনই কাজে অনুপস্থিত ছিল (চিত্র ২২)। এই সময়কালের পর কাজে অনুপস্থিতি অনেক কমে যায়, যা মার্চ-মে মাসে ৭৭ শতাংশ থেকে কমে জুন-সেপ্টেম্বর মাসে ৫ শতাংশে নেমে আসে।

জরিপে দেখা গেছে,পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে নারী শ্রমিকরা কাজে কম অনুপস্থিত থেকেছে, এবং এর মূল কারণ হল নারী শ্রমিক অধ্যুষিত চা বাগান ও এস্টেটগুলো খোলা ছিল। নির্মাণ, চামড়া ও তৈরি পোশাকখাতের প্রায় সব শ্রমিকই জানিয়েছে যে তারা ২০২০ সালের মার্চ মাসের শেষভাগ থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত কাজে অনুপস্থিত ছিল।

আরও দেখা গেছে, প্রতি ১০ জন শ্রমিকে প্রায় ৭ জন কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল কারণ কাজের জায়গা বা কর্মস্থল বন্ধ ঘোষণা করায় কাজে অনুপস্থিত থেকেছে, ৪ জন এলাকাভিত্তিক সরকারি বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়েছে, ৩ জন কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতে যানবাহনের অপ্রতুলতার কারণে সমস্যায় পড়েছে। প্রতি ১০ জনে মাত্র ১ জন আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কর্মস্থলে না যাওয়ার বিষয়ে নিয়োগকর্তা/মালিকের কাছ থেকে ফোন পেয়েছে। কাজে অনুপস্থিত থাকার কারণ হিসেবে অধিকাংশ শ্রমিক ১টি কারণ, কেউ কেউ ২টি কারণ এবং খুবই কমসংখ্যক শ্রমিক ৩ বা ৪টি কারণ উল্লেখ করেছে। নিজের বা পরিবারের কারও অসুস্থতাকে কাজে অনুপস্থিতি থাকার কারণ হিসেবে কদাচিৎ উল্লেখ করা হয়েছে।

চিত্র ২২:মার্চের শেষভাগ থেকে মে মাসের শেষভাগ এবং জুন থেকে সেপ্টেম্বর/অক্টোবর পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজে অনুপস্থিতি

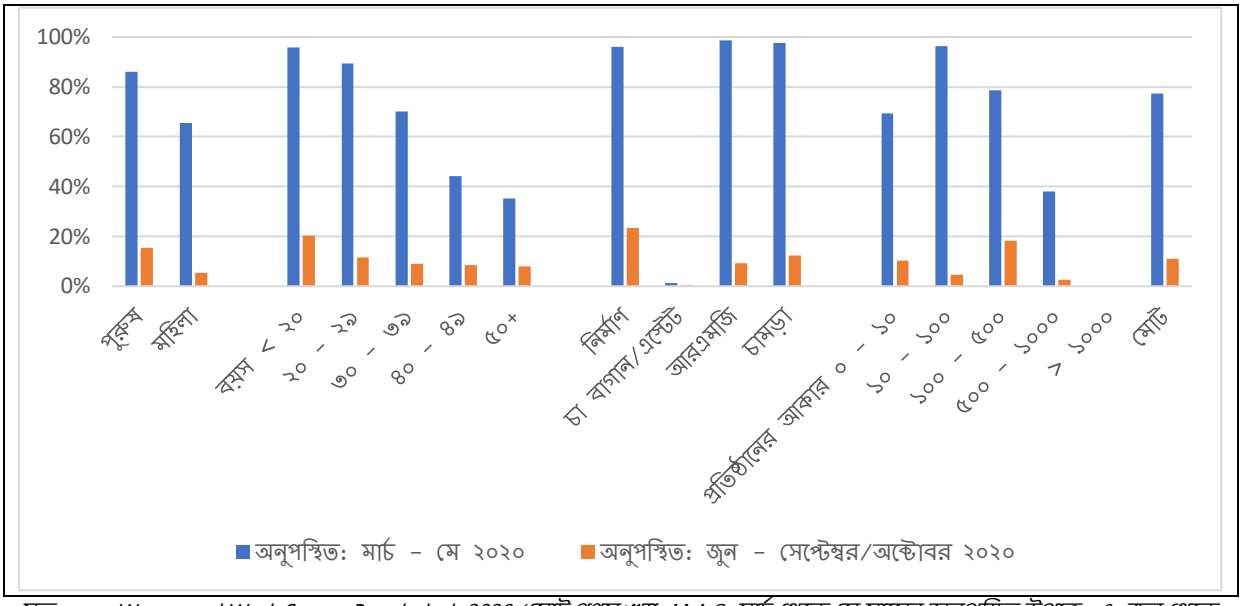

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা= ১৮৯৪, মার্চ থেকে মে মাসের অনুপস্থিত উপাত্ত = ৭, জুন থেকে সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর মাসে অনুপস্থিতি উপাত্ত= ২২)

কোভিড-১৯ এর কারণে অনুপস্থিত কার্যদিবস

২০২০ সালের এপ্রিল মাসে যে সকল শ্রমিককে "অনুপস্থিত" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তারা সেই মাসে প্রায় সকল কর্মদিবসে কাজে অনুপস্থিত ছিল (দেখুন চিত্র ২৩)। নির্মাণখাতে মে ও জুন মাসে অনুপস্থিতির হার বেশি ছিল, যা জুলাই মাসে কিছুটা কমে এবং আগস্ট মাসে পূর্ববর্তী মাসের চেয়ে আরও বেশি কমে যায়। তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতে ভিন্ন চিত্র লক্ষ করা যায়। এপ্রিল মাসের পর মে মাসে কাজে অনুপস্থিতি দিনের সংখ্যা দ্রুত নিম্নগামী হলেও জুন মাসে বেড়ে আবার জুলাই মাসে কমে যায় এবং আগস্ট মাসে পুনরায় আরও বেশি কমে যায়। তৈরি পোশাক খাতের তুলনায় চামড়া খাতে মার্চ থেকে আগষ্ট মাসে কাজে অনুপস্থিত দিনের সংখ্যা বেশি পরিলক্ষিত হয়। তবে এপ্রিল মাসে সামান্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায় কারণ এপ্রিল মাসে চামড়া খাতের তুলনায় তৈরি পোশাক খাতে কাজে অনুপস্থিত দিনের সংখ্যা সামান্য বেশি ছিল। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রায় সকল খাতেই কাজে অনুপস্থিত দিনের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

চিত্র ২৩:অনুপস্থিত কর্মীদের অনুপস্থিত দিনের সংখ্যা, মাস ও খাত ভেদে

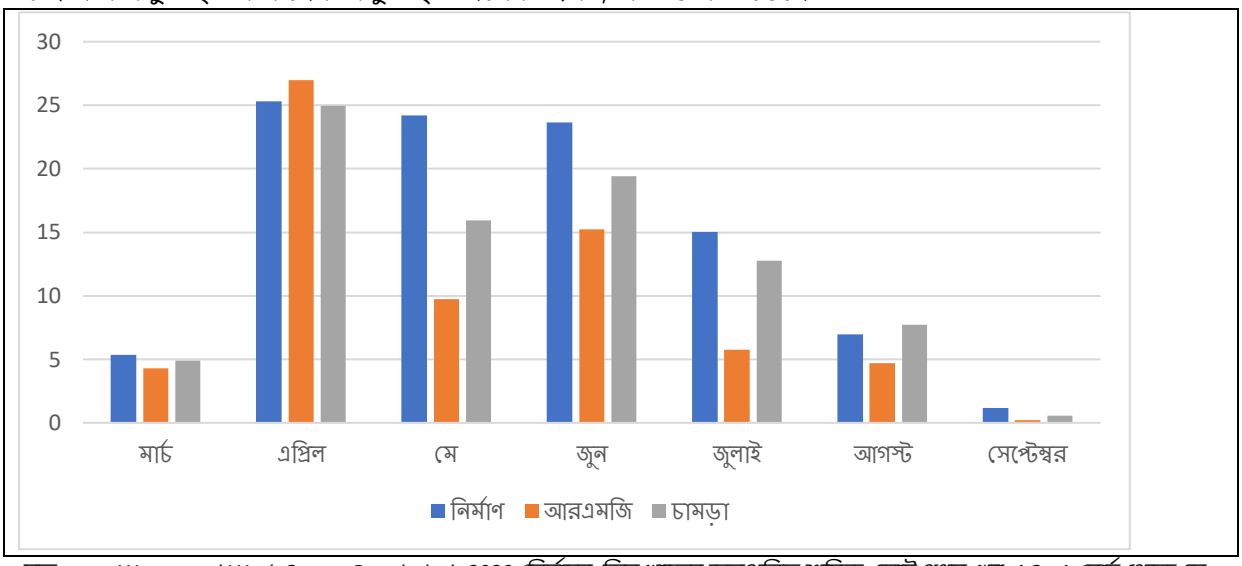

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (নির্বাচন: তিন খাতের অনুপস্থিত শ্রমিক, মোট গণসংখ্যা=১৪০৫ (মার্চ থেকে মে পর্যন্ত) এবং মোট গণসংখ্যা=২০৪ (জুন-সেপ্টেম্বর/অক্টোবর পর্যন্ত)

হ্রাসকৃত মজুরি

কোভিড-১৯ এর কারণে শ্রমিকরা কি মজুরি হ্রাসের শিকার হয়েছিল? এই প্রশ্নটি কাজে অনুপস্থিত শ্রমিক সহ নির্বিশেষে সকল শ্রমিককে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। যেসব শ্রমিক কাজে অনুপস্থিত ছিল না তারাই কদাচিৎ মজুরি হ্রাসের সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু যারা কাজে অনুপস্থিত ছিল (৮৩ শতাংশ) তাদের প্রায় সকলেরই মজুরি কমানো হয়েছে। এখানে লিঙ্গ, বয়স, খাত, চুক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আকার ভেদে সামান্য তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে। শ্রমিকদের বিভিন্ন গ্রুপের ক্ষেত্রে মজুরি হ্রাসের নীতি সমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। মজুরি হ্রাসের প্রধান কারণ ছিল কারখানাগুলো বন্ধ থাকা, তবে কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা কমে যাওয়ার কারণেও মজুরি হ্রাস পেয়েছে। অতিরিক্ত সময় বা ওভারটাইম কাজ না করতে পারাও আয় কমে যাওয়ার একটি কারণ বলে জানায় কর্মীরা।

মজুরি হ্রাসের সম্মুখীন হওয়া শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করা হয় তারা এ বিষয়টি কীভাবে সামাল দিয়েছে। এক্ষেত্রে খুবই কম সখ্যক শ্রমিক জানায় যে তারা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে (উভয় হ্রাসকৃত মজুরির স্বীকারের ৪%)। প্রতি ১০ জনে ২ জনের বেশি শ্রমিক সরকারের নিকট থেকে খাদ্য সহায়তা পেয়েছে এবং ১ জনের কম নিয়োগদাতা বা মালিকের নিকট থেকে রেশন/খাদ্য ভর্তুকি পেয়েছে। মজুরি হ্রাসের সম্মুখীন হয়েছে এমন শ্রমিকদের একটি বড় অংশ বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে (৬৬ শতাংশ)। অন্যদিকে, প্রতি ১০ জনে ২ জন শ্রমিক ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে এবং ১ জনের সামান্য বেশি শ্রমিক ক্ষুদ্র ঋণদাতাদের নিকট থেকে ধার নিয়েছে।

চিত্র ২৪:হ্রাসকৃত মজুরির সাথে মানিয়ে নেয়া

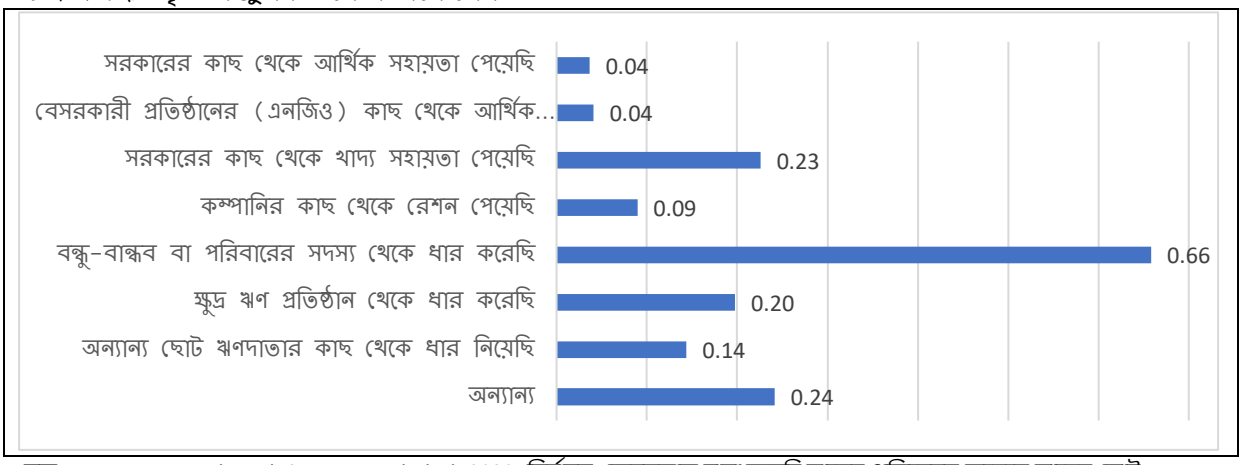

সুত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (নির্বাচন: কেবলমাত্র যারা মজুরি হ্রাসের প্রতিবেদন করেছে তাদের মোট গণসংখ্যা=১১৯৫)

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাদের মধ্যে কারা বন্ধুবান্ধব বা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ধারকর্জ করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে নারী শ্রমিকদের চেয়ে পুরুষ শ্রমিকরা এবং, অন্য বয়স গ্রুপের চেয়ে ৪০-৪৯ বছর বয়স গ্রুপের শ্রমিকরা বেশি ধারকর্জ করেছে অধিকন্তু দুইয়ের অধিক সন্তানের দম্পতিরা অন্য ধরনের পরিবারের চেয়ে বেশি ধারকর্জ করেছে (চিত্র ২৫ দেখুন)।

চিত্র ২৫:হ্রাসকৃত মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকদের শতকরা হার (যারা পরিবার ও বন্ধ-বান্ধবদের থেকে ধার নিয়েছে), লিঙ্গ, বয়স ও খানার ধরন ভেদে

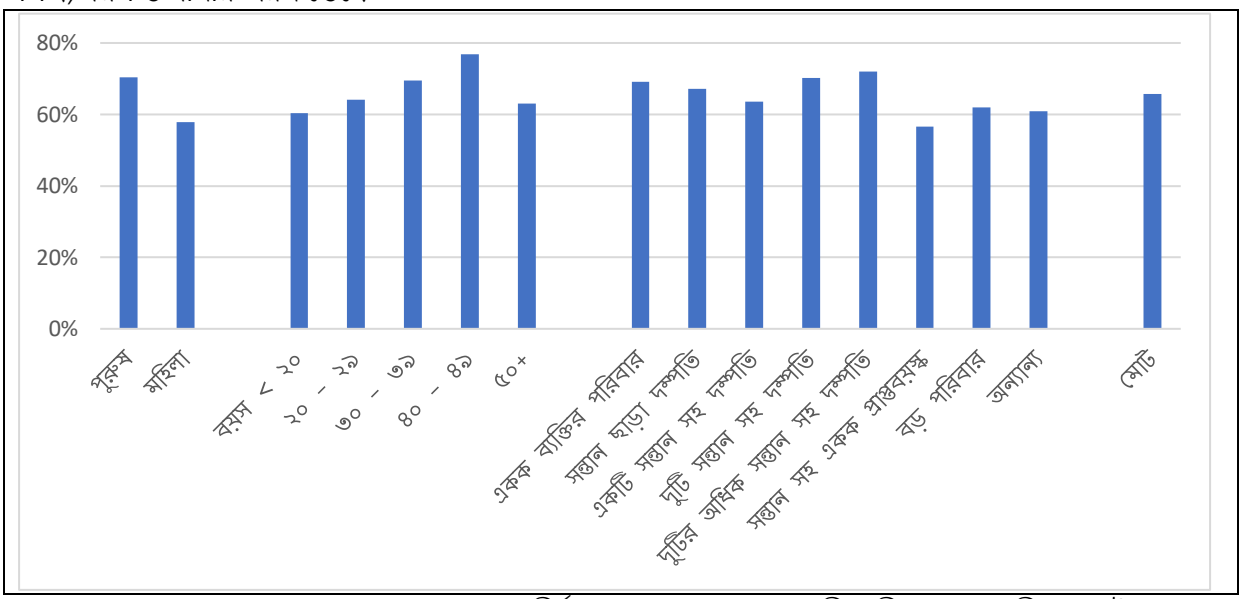

সুত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (নির্বাচন: কেবলমাত্র হ্রাসকৃত মজুরির প্রতিবেদন করা শ্রমিকের মোট গণসংখ্যা= 1195)

কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি

জরিপে অংশগ্রহণকারীদের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত বেশ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমন কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর ঝুঁকি আছে কি? নিরাপদ দূরত্ব, ব্যক্তিগত কাজের স্থান এবং প্রক্ষালন কক্ষ

সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয়েছে (চিত্র ২৬)। শ্রমিকরা খাবার ঘরে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা বা জায়গা ফাঁকা রেখে বসার ব্যবস্থাকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমিক ইতিবাচক হিসেবে দেখেছে (৫৬ শতাংশ একে কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দেখেছে, এরপরেই রয়েছে একই কাজের যন্ত্রাংশ একাধিক কর্মী ব্যবহার না করে প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যবহারের সুযোগ থাকা (৪৬ শতাংশ একে কম ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে। তবে তারা কর্মস্থানে একেকজনের কাজের স্টেশনের মাঝে দূরত্ব এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রক্ষালন কক্ষকে সবচেয়ে কম ইতবিাচক মনে করেছে (যথাক্রমে ৩৯ ও ৩৮ শতাংশ শ্রমিক একে কম ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে)। প্রতি ১০ জনের মাঝে ২ জন শ্রমিক প্রক্ষালন কক্ষের সংখ্যাকে অর্থাৎ প্রক্ষালন কক্ষ বেশি থাকাকে অতি ঝুঁকিপূর্ণ মনে করে।

দ্বিতীয় প্রশ্নমালায় শ্রমিকদের ৫ ধরনের স্বাস্থ্য বিষয়ক সুবিধার পর্যাপ্ততা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে বলা হয় (চিত্র ২৭)। শ্রমিকদের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হাত ধোয়ার সুবিধাকে পর্যাপ্ত ও কম ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করে। পক্ষান্তরে, প্রতি ১০ জন শ্রমিকের মাঝে ৭ জনের বেশি গ্লাভসের সরবরাহ পর্যাপ্ত নয় বলে উল্লেখ করেছে।

বক্স ৬: সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা

চা বাগানের শ্রমিকরা সাধারণত মাস্ক পরিধান করে না। কোনো দর্শনার্থীকে মাস্ক পড়ে থাকতে দেখলে শ্রমিকরা তাদেরকে কোভিড আক্রান্ত বলে মনে করে থাকে। গ্রাম এলাকায় যেখানে মানুষ মাস্ক পরিধান করে না, সেসব জায়গাতেও একই ধরনের মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। বেশ কিছু তৈরি পোশাক কারখানাতে কোভিড মোকাবেলায় হাত ধোয়ার সুবিধা স্থাপনসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একটি কারখানায় শ্রমিকদের জন্য ২০০-৩০০ পানির কল স্থাপনসহ হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান, মাস্ক এবং তাপমাত্রা মাপার যন্ত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ২-৩টি কারখানায় স্বাস্থ্যবিধির ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। জরিপের একটি দল লক্ষ্য করেছে যে বেশিরভাগ তৈরি পোশাক শ্রমিক অনেক সচেতন এবং মাস্ক পরিধান করে। আরেক দল লক্ষ্য করেছে যে কাজের প্রকৃতি ও কারখানার পরিসর বা জায়গা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে অনেক কারখানায় নিরাপদ দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কঠিন অর্থাৎ সম্ভব নয়।

চিত্র ২৬: পাঁচ ধরনের পরিমাপ পর্যাপ্ত সরবরাহের ঝুঁকি নিরূপণ

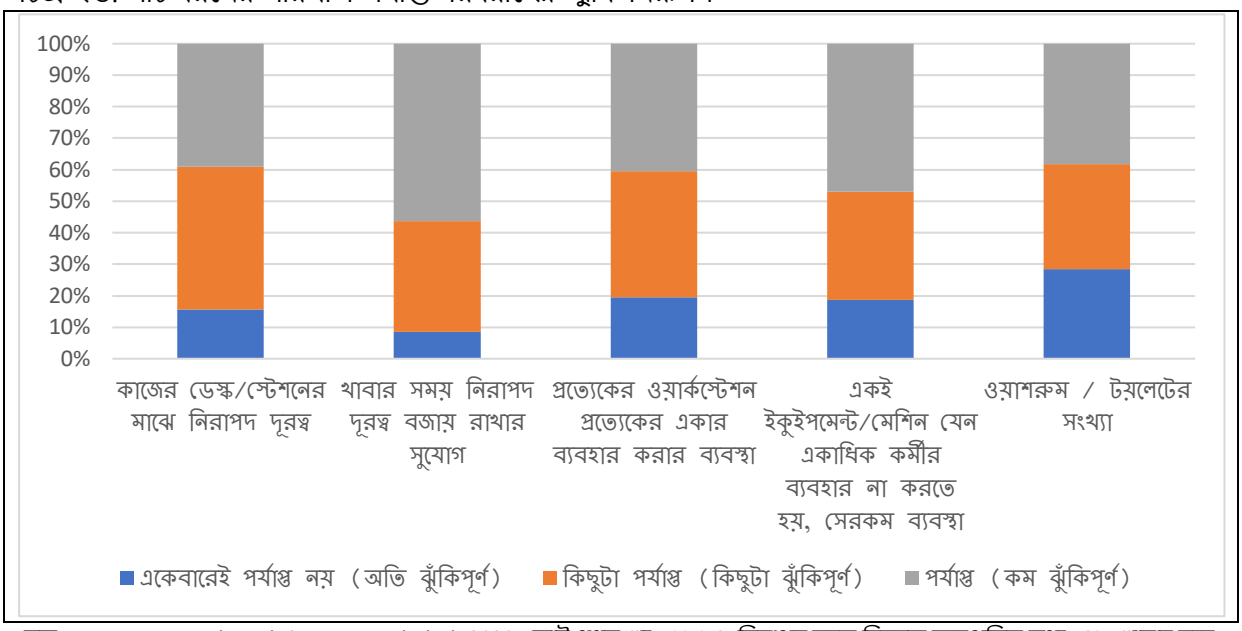

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা= ১৮৯৪, নিরাপদ দূরত্ব বিষয়ক অনুপস্থিত তথ্য=৪৮, খাবার ঘরে জায়গা= ২৩, ব্যাক্তিগত কাজের ডেস্ক/স্থান = ৩৯, ব্যাক্তিগত ব্যবহারের মেশিন/যন্ত্রপাতি=৫৭, প্রক্ষালন কক্ষ=২৮)

চিত্র ২৭: পাঁচ ধরনের স্বাস্থ্যসুবিধা অপ্রতুল সরবরাহজনিত ঝুঁকি যাচাই

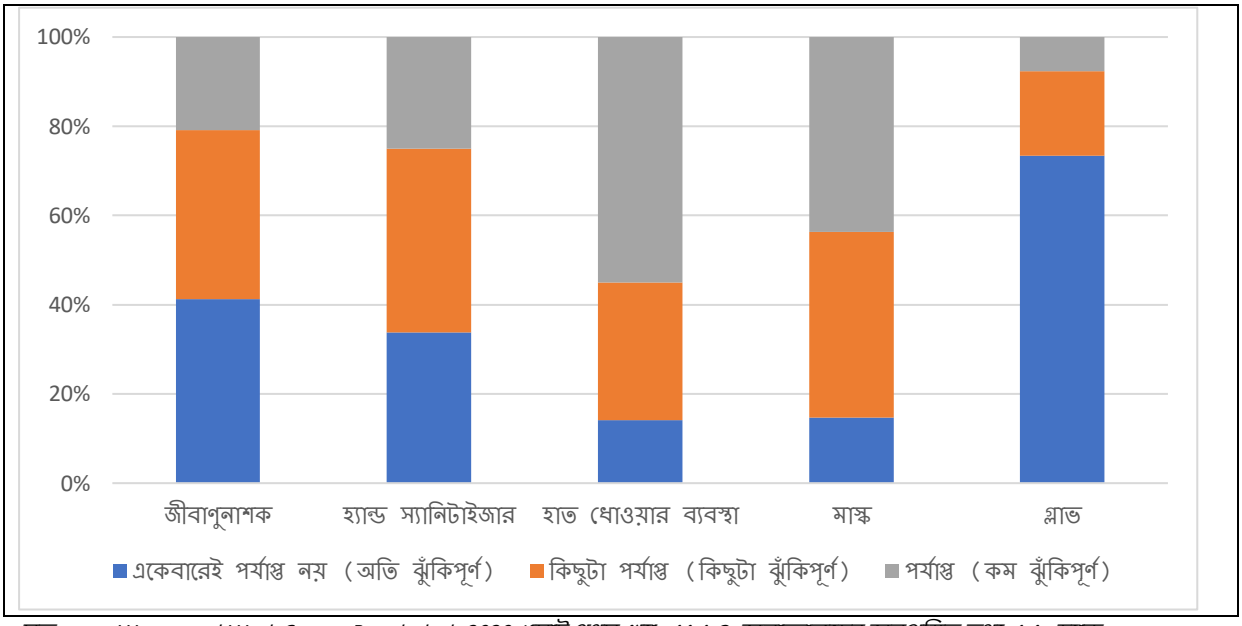

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা= ১৮৯৪, অনাক্রান্তদের অনুপস্থিত তথ্য=১৬, হ্যান্ড স্যানিটাইজার=১৮, হাত ধোয়ার ব্যবস্থা=১৩, মাস্ক=১৪, গ্লাভস=১৩৬)

৯। খানার গঠন কাঠামো ও আয়

বক্স ৭: বাংলাদেশ মজুরি ও কর্ম জরিপ– গবেষণা পদ্ধতি

জরিপে শ্রমিকদেরকে তাদের খানা (পরিবার) সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে। সে কি খানায় অন্য সদস্যদের সাথে বাস করে এবং যদি করে, কয়জনের সাথে বাস করে? পরিবারে কি সন্তান বা সৎসন্তানরা বাস করে? পরিবারের কতজন সদস্য পারিবারিক আয়ে অবদান রাখে? এই অধ্যায়ে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত খানার গঠন ও আয় সংক্রান্ত ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে।

জীবনসঙ্গী ও সন্তানদের সাথে বসবাস

চিত্র ২ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতি ১০ জন শ্রমিকে প্রায় ৬ জন জীবনসঙ্গী (স্বামী/স্ত্রী) এবং এক বা একাধিক সন্তানের সাথে বসবাস করে। এটি কম বয়সী শ্রমিকদের চেয়ে ৩০ বা তদূর্ধ্ব বয়সী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বেশি লক্ষ্য করা গেছে। প্রতি ১০ জন শ্রমিকের মাঝে ২ জনের কোনো জীবনসঙ্গী ও ছেলেমেয়ে নেই। বয়স্ক শ্রমিকদের চেয়ে কম বয়সী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা বেশি প্রযোজ্য। ২০ জন শ্রমিকের মাঝে ১ জন জীবনসঙ্গী ছাড়া কিন্তু এক বা একাধিক সন্তানের সাথে বসবাস করে এবং ৪০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বিষয়টি প্রায়শই ঘটে থাকে।

চিত্র ২৮: খানার গঠন কাঠামো (বয়স গ্রুপ, লিঙ্গ ও মোট সংখ্যা ভেদে)

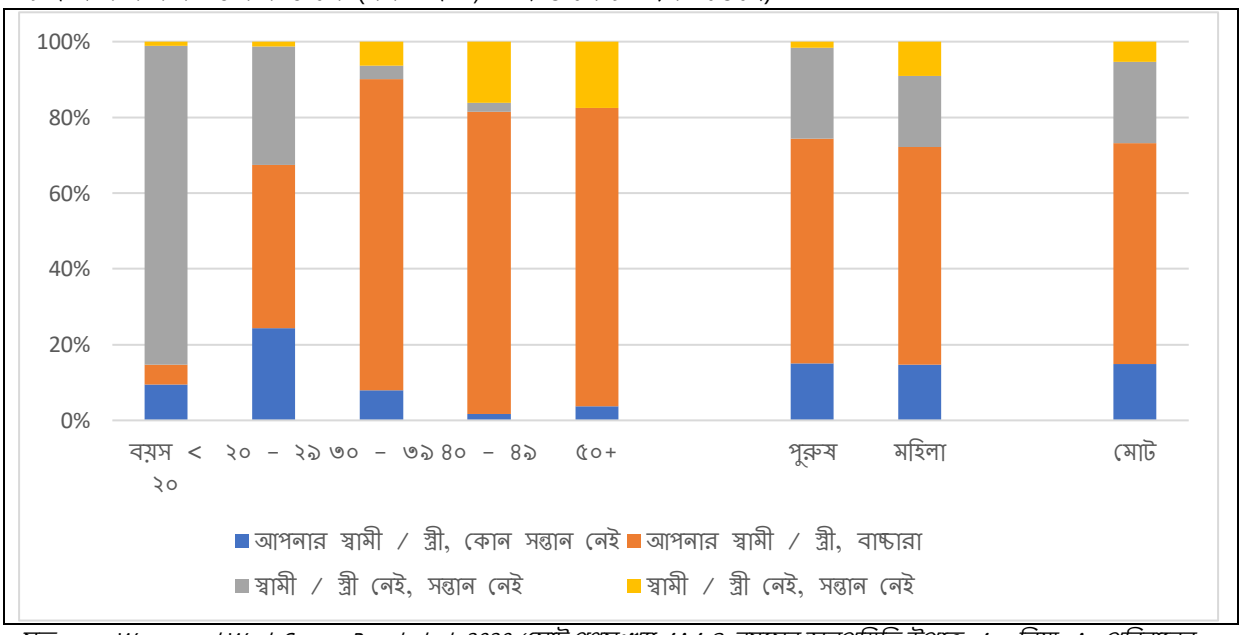

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা=১৮৯৪, বয়সের অনুপস্থিতি উপাত্ত =১০, লিঙ্গ=৬, পরিবারের সদস্য=৮)

খানার আকার বা সদস্য সংখ্যা

জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের খানায় গড়ে ৩.৬ জন সদস্য বাস করে। চিত্র ২৯ থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতি ১০ জন শ্রমিকে প্রায় ২ জন একক পরিবারে বাস করে (কলাম যোগফল: ১৮%)। অন্যদিকে প্রতি ১০ জন শ্রমিকে প্রায় ৬ জন শ্রমিকের খানায় ৫ জন সদস্য এবং প্রায় ২ জন শ্রমিকের খানায় ৬ বা

ততোধিক সদস্য বাস করে (১৮ শতাংশ)। বিশেষ করে ৪০ বা তদূর্ধ্ব বয়সী শ্রমিকরা বড় আকারের খানায় বাস করে। নারী শ্রমিকদের চেয়ে পুরুষ শ্রমিকরা প্রায়শই একক বা এক সদস্যবশিষ্ট খানায় বাস করে।

চিত্র ২৯: *খানার আকারের বিভাজন* (বয়স গ্রুপ, লিঙ্গ এবং মোট সংখ্যার ভিত্তিতে)

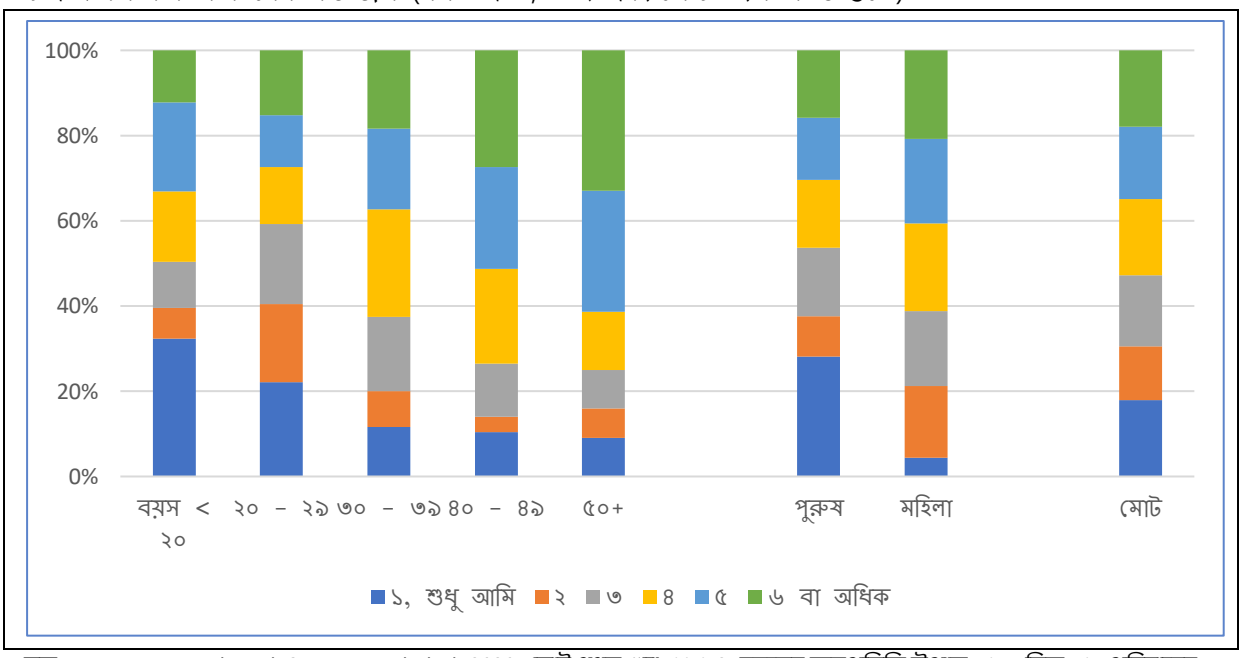

সূত্র: Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গণসংখ্যা= ১৮৯৪, বয়সের অনুপস্থিতি উপাত্ত = ১০, লিঙ্গ= ৬, পরিবারের সদস্য= ৮)

খানার আয়

জরিপের শেষ প্রশ্নগুলো ছিল খানার আয় সম্পর্কিত: "আপনার খানার কয়জন সদস্য কাজ, সুবিধা বা অন্য কোনো সূত্র থেকে আয় করে?" এ প্রশ্নের উত্তরে প্রতি ১০ জন শ্রমিকে প্রায় ৩ জন বলেছে তারাই খানার একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। অন্যদিকে ১০ জনের মাঝে ৪ জনের বেশি শ্রমিকের খানায় ২ জন উপার্জনকারী সদস্য ৩ জন আর মাঝে বাকি ৩ জনের খানায় ৩ বা ততোধিক উপার্জনকারী সদস্য বাস করে।

পরিবারের সদস্যদের কাছে টাকা প্রেরণ খানার খরচের একটি অংশ কিন্তু জরিপে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটি খুব কম পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রতি ৪০ জন শ্রমিকের মাঝে মাত্র ১ জন বাড়িতে পরিবারের সদসদের কাছে টাকা পাঠায়। নারী শ্রমিকদের বা বয়স্ক শ্রমিকদের তুলনায় পুরুষরা এবং ২০-৩০ বছর বয়সী শ্রমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়িতে টাকা পাঠায়। ঢাকা বিভাগের শ্রমিকরা বাড়িতে টাকা পাঠালেও সিলেট বা চট্টগ্রাম অঞ্চলের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায়নি।

বাড়িতে টাকা পাঠানোর চেয়ে বিদেশে অবস্থিত আত্মীয় স্বজনের নিকট থেকে টাকা অর্থাৎ রেমিটেন্স প্রাপ্তির বিষয়টি বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে: প্রতি ২০ জন শ্রমিকে ১ জন রেমিটেন্স প্রাপ্তির কথা বলেছে, যা খানার আয়ে ভূমিকা রাখে। বিদেশ থেকে দেশে প্রেরিত অর্থ অর্থাৎ রেমিটেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী

শ্রমিকদের চেয়ে বেশি সংখ্যক পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে রেমিটেন্স গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য বয়সী শ্রমিক বিশেষ করে অল্প বয়সী শ্রমিকদের চেয়ে ৫০ বছরের বেশি বয়সী শ্রমিকদের সংখ্যা বেশি। চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের তুলনায় ঢাকা অঞ্চলের শ্রমিকদের কাছে মধ্যে রেমিটেন্স গ্রহণকারীর সংখ্যা বেশি।

১০। নিম্নতম মজুরি

নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ

বাংলাদেশে কোনো পৃথক নিম্নতম মজুরি আইন নেই কিন্তু একটি শ্রম আইন রয়েছে যা বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধিত) ২০১৩ হিসেবে পরিচিত। দেশে নিম্নতম মজুরি হার সুপারিশের দায়িত্ব শ্রম আইন ২০১৩ এর অধীনে গঠিত নিম্নতম মজুরি বোর্ডের। নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণের পদ্ধতি হল কিছু নির্দিষ্ট শিল্পখাত এবং কর্মদক্ষতার জন্য মজুরি বোর্ড প্রণীত সুপারিশের উপর ভিত্তি করে সরকার নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ করে। শ্রম আইন অনুযায়ী সরকার মজুরি বোর্ড গঠন করে। একজন চেয়ারম্যান, একজন নিরপেক্ষসদস্য, সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী একজন সদস্যের সমন্বয়ে মজুরি বোর্ড গঠিত হয়।[১৬]

মজুরি হার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে মজুরি বোর্ড জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাত্রার মান, উৎপাদন খরচ, দ্রব্যের মূল্য, ব্যবসায়িক দক্ষতা, মূল্যস্ফীতি, দেশের ও সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে থাকে। উল্লেখিত কোনো একটি বিষয়ে পরিবর্তন ঘটলে (১ থেকে ৩ বছরের মধ্যে) মজুরি বোর্ড তাদের কোনো সুপারিশ সংশোধন করতে বাধ্য। সরকার প্রতি ৫ বছর অন্তর শিল্প খাতের মজুরি পুন:নির্ধারণ করতে পারে। নিম্নতম মজুরি মূলত শিল্পখাতের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয় এবং তা সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিকদের জন্য অবশ্য পালনীয়। শ্রমিকদের নিম্ননতম মজুরি প্রদান না করা দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এর শাস্তি ১ বছরের কারাবাস বা জরিমানা।[১৭]

মূল মজুরি ও ভাতাসমূহ

শ্রম আইনে (২০১৩) নিম্নতম মজুরিকে পেনশন ও পারিতোষিক (Gratuity) পরিশোধ, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাদি (নগদে), যাতায়াত ভাতা, আবাসন ভাতা (Accommodation), খাদ্য ভাতা, বিদ্যুৎ, পানির বিল এবং শুল্ক, কর, চিকিৎসা ভাতা এবং বিনোদন ভাতা বাদে মূল মজুরি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে নিম্নতম মজুরি বাংলাদেশি টাকায় ১,৫০০ টাকা যা ২০১৩ সাল থেকে অপরিবর্তিত রয়েছে।

শিল্পখাত, পদবী ও দক্ষতার স্তরের ভিত্তিতে মাসিক নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা আছে। শিল্প খাতের নিম্ন মজুরি হার মূল মজুরির সাথে বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা এবং কিছু ক্ষেত্রে খাদ্য ভাতা যুক্ত করে নির্ধারণ করা হয়। বাড়ি ভাড়া ভাতা মূল মজুরি হারের উপর নির্ভরশীল। বাড়ি ভাড়া

---

১৬ সুত্রঃ https://wageindicator.org/labour-laws/labour-law-around-the-world/minimum-wages-regulations/minimum-wages-regulations-Bangladesh

১৭ এই অনুচ্ছেদের ভিত্তিঃ https://mywage.org.bd/labour-laws/work-and-wages

ভাতা বিভাগীয় শহরগুলোতে মূল মজুরির ৫০% এবং অন্যান্য এলাকায় মূল মজুরির ৪০%। একই শিল্পের অধীনে সকল নিম্নতম মজুরি ক্যাটাগরিতে চিকিৎসা ভাতা, খাদ্য ভাতা ও যাতায়াত ভাতা সমান পরিমাণে দেয়া হয় তবে বিভিন্ন শিল্পখাতে এই ভাতাগুলোর ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য লক্ষ করা যায়। এই ভাতাগুলো মূল মজুরিত বহুলাংশে অবদান রাখে। মোট বেতনে মূল মজুরি ১.৫ থেকে ২.০ পর্যন্ত গুণ করা হয়, যা ওয়েজইন্ডিকেটরের নিম্নতম মজুরি ডাটাবেজ থেকে হিসাব করা যায়।

চারটি নির্বাচিত শিল্প খাতে নিম্নতম মজুরি

২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে শ্রমিক বিক্ষোভের পর সরকার তৈরি পোশাক শিল্পের মাসিক নিম্নতম মজুরি ২০১০ সালের নির্ধারিত ৩,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫,৩০০ টাকায় উন্নীত করে যা ২০১৩ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। একজন তৈরি পোশাক শ্রমিকের নিম্নতম মূল মজুরি ৩,০০০ টাকা, এর সাথে যুক্ত করা হয় মূল মজুরির উপর ৫% বার্ষিক বৃদ্ধি, ৪০% বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা ২৫০ টাকা , যাতায়াত ভাতা ২০০ টাকা, খাদ্য ভাতা ৬৫০ টাকা। মূল মজুরির সাথে এসব ভাতা যুক্ত হয়ে মোট মাসিক নিম্নতম মজুরি দাঁড়ায় ৫,৩০০ টাকা। ২০১৮ সালের ১লা ডিসেম্বর মাসিক মোট নিম্নতম মজুরি ৫,৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮,০০০ টাকা করা হয়। এরপর মজুরি আর বাড়ানো হয়নি।

বক্স ৮: নিম্নতম মজুরি – গবেষণা পদ্ধতি

২০২০ সালের অক্টোবর মাসে বিআইডিএস এর গবেষক দল দেশের ৫টি শিল্প খাতের (টেক্সটাইল, সড়ক পরিবহন, প্লাস্টিক, রিরোলিং মিলস এবং চামড়া ও পাদুকা) উপর গঠিত ৫ টি মজুরি বোর্ডের নিম্নতম মজুরি বিষয়ক সর্বশেষ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করে। পিডিএফ ফরম্যাটে থাকা নথিগুলো এক্সেল ফাইলে রূপান্তরিত করা হয়, অনুবাদ করা হয় এবং ওয়েজইন্ডিকেটরের নিম্নতম মজুরি ডেটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ডাটাবেজ ইতোমধ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের নিম্নতম মজুরি তথ্যভাণ্ডারে রাখা ছিল। এই উপাত্তগুলো মজুরি ও কর্ম জরিপে উল্লেখিত মজুরি হারের সাথে প্রযোজ্য নিম্নতম মজুরি হারের তুলনা করতে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া উপাত্তগুলো ওয়েজ ইন্ডিকেটরের বাংলাদেশ ওয়েবসাইটের নিম্নতম মজুরি পেইজ হালনাগাদ করেতে ব্যবহৃত হয়েছে। দেখুন https://mywage.org.bd/salary/minimum-wage এবং ইংরেজিতে দেখুন https://wageindicator.org/salary/minimum-wage/bangladesh

এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত ৪টি শিল্পখাতের মাঝে শুধুমাত্র তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতেই নিম্নতম মজুরি আছে কিন্তু চা এবং নির্মাণ খাতের জন্য নেই। ওয়েজইন্ডিকেটরের নিম্নতম মজুরি তথ্যভান্ডারে ৭টি শিল্পখাতের জন্য শিল্পখাত-নির্দিষ্ট নিম্নতমতম মজুরি হার রয়েছে এবং এই তথ্যগুলো ওয়েজইন্ডিকেটরের ওয়েবপেজে ইংরেজি এবং বাংলায় দেয়া আছে। অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও নিম্নতম মজুরি দক্ষতার উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয় যা ৭টি শিল্প খাতের মাঝে ৬টি শিল্প খাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু তৈরি পোশাক খাতের জন্য প্রযোজ্য নয়। চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর নিম্নতম মজুরি হার পুন:নির্ধারণ করা হয়। তৈরি পোশাক খাতে মাত্র একটি নিম্নতম মজুরি হার থাকলেও চামড়া খাতে ৩ ধরনের দক্ষতার জন্য ৩টি নিম্নতম মজুরি হার রয়েছে যেখানে সর্বোচ্চ দক্ষতাকে গ্রেড-১ এবং সর্বনিম্ন দক্ষতাকে গ্রেড-৩ নির্ধারণ করা হয়েছে। চিত্র ৩০ থেকে

দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় পর্যায়ে নিম্নতম মজুরির মাসিক হার ১,৫০০ টাকা, তৈরি পোশাক খাতের জন্য ৮,০০০ টাকা এবং চামড়া খাতে অতি দক্ষ শ্রমিকের জন্য ১৩,৫২০ টাকা এবং অপেক্ষাকৃত কম দক্ষ শ্রমিকের জন্য ৯,৩৫০ টাকা।

চিত্র ৩০:জাতীয় পর্যায়ে নিম্নতম মজুরি, তৈরি পোশাক খাত এবং চামড়া খাতের গ্রেডভিত্তিক মজুরি (মাসিক মোট ন্যূনতম মজুরি বাংলাদেশি টাকায়)

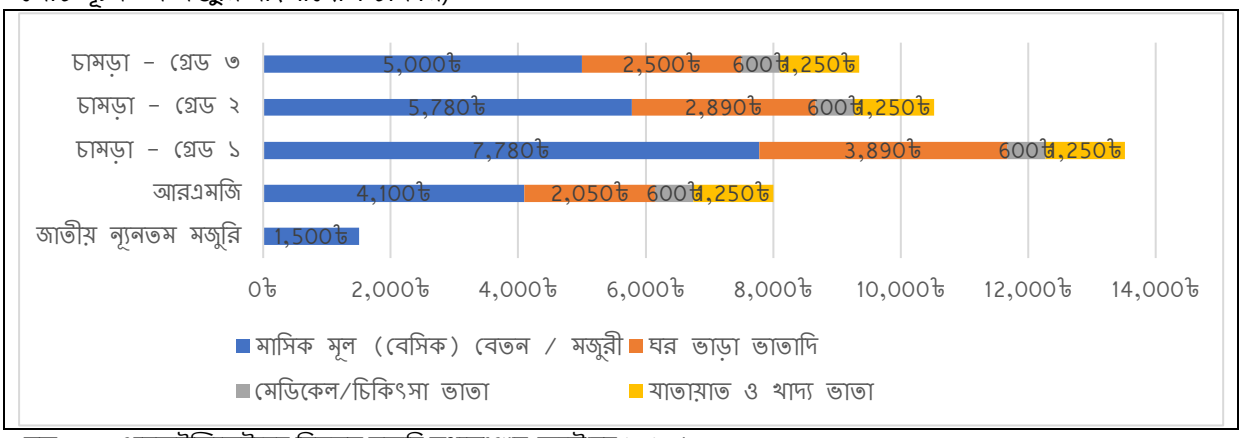

সূত্র: ওয়েজইন্ডিকেটরের নিম্নতম মজুরি তথ্যভাণ্ডার, অক্টোবর ২০২০।

১১। যৌথ দরকষাকষি চুক্তি

বাংলাদেশে যৌথ দরকষাকষি

আইনসিদ্ধ উপায়ে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নগুলো যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ) হিসেবে মালিকদের সাথে আলোচনার করার অধিকার রাখে (ডিটিডিএ, ২০২০)। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (এমওএলই) এর বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬টি এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৬টি যৌথ দরকষাকষি এজেন্ট শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত হয়েছে। যৌথ দরকষাকষি চুক্তি আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে একটি নতুন বিষয় এবং এ ধরনের চুক্তি স্বাক্ষরের সংখ্যা বাড়ছে। যৌথ দরকষাকষি চুক্তির সংখ্যা ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ১৬টি থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে ৫৭টিতে উন্নীত হয়। অধিকন্তু ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে আরও ৬টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (ডিটিডিএ, ২০২০)। অ্যাকশন, কলাবোরেশন, ট্রান্সফর্মেশন (এসিটি) উদ্যোগটির লক্ষ্য হল সামাজিক সংলাপ বাড়ানো। লাউডস ফাউন্ডেশন যৌথ দরকষাকষি বিষয়টির প্রসরের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশিকা এবং উদাহরণহ প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে (সল্ট মার্শ,২০১৯)।

সংগৃহীত যৌথ দরকষাকষি চুক্তিরসংখ্যা এবং প্রতিনিধিত্বশীলতা

আগেই বলা হয়েছে যে (দেখুন প্রথম অধ্যায়), *Decent Wage Bangladesh* প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো মজুরির প্রকৃতি, ধরন ও যৌথ শ্রম চুক্তি বিষয়ক জ্ঞান ও গবেষণায় অবদান রাখা এবং গৃহীত ৫টি গবেষণার মধ্যে একটি ছিল যৌথ শ্রমচুক্তির স্টক নেয়া। ২০২০ সালে বিআইডিএস এবং ওয়েজইন্ডিকেটর দুটি খাত থেকে যৌথ দরকষাকষি চুক্তির কপি সংগ্রহ করে- ১৩টি চামড়া খাত থেকে এবং তৈরি পোশাক খাত থেকে ১৪ টি। নির্মাণখাতের কাজের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রকৃতির কারণে সম্ভবত এই খাতে যৌথ দরকষাকষি চুক্তির কপি পাওয়া যায়নি। চা খাতে যৌথ দরকষাকষি চুক্তির কপি দেখা গেছে কিন্তু তা প্রদানে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির নিশ্চয়তা দেয়া সত্ত্বেও বিআইডিএস গবেষণা দলকে তা সময়মতো সরবরাহ করা হয়নি। চামড়া ও তৈরি পোশাক খাতের সকল চুক্তি সংগৃহীত চুক্তিগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। চামড়া খাতের চুক্তিগুলো খাতভিত্তিক কিন্তু তৈরি পোশাক খাতের চুক্তিগুলো কারখানা পর্যায়ের এবং কেবলমাত্র বিষয়ভিত্তিক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত করে।[১৮]

তৈরি পোশাক ও চামড়া খাতের ক্ষেত্রে যৌথ দরকষাকষি চুক্তির নমুনাকে মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ এর অন্তর্ভুক্ত নমুনা ফ্যাক্টরিগুলোর তুলনা করা যেতে পারে। চামড়া খাতের চুক্তিগুলো মূলত ঢাকা শহর

---

১৮ মোট ২৭ টি চুক্তি সংগ্রহ করা হয়। যার মধ্যে ২৫টি বাংলায় ও ২টি ইংরেজীতে লেখা। এ ২৭টি চুক্তির মধ্যে ২টি চুক্তি (বাংলা) সংগ্রহ করেছিল ওয়েজইন্ডিকেটার আর বাকি ২৫টি বিআইডএস সংগ্রহ করে। ইংরেজীতে লেখা ২টি চুক্তি এ্যাপেক্স হোল্ডিংস লিমিটেড কোম্পানির সাথে করা চুক্তি এবং চুক্তি দুটো কারখানার সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের ২টি পৃথক বিষয় সম্পর্কিত ।

ও এর পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোসহ ঢাকা বিভাগের ট্যানারী গুলোর। ঢাকা বিভাগের বাইরের চামড়া কারখানাগুলোতে কোনো যৌথ দরকষাকষি চুক্তি পাওয়া যায়নি। মজুরি ও কাজ জরিপ ২০২০ এর নমুনাভুক্ত চামড়া কারখানাগুলোর অধিকাংশই ঢাকা বিভাগে এবং ঢাকা বিভাগের ৮০ শতাংশ চামড়া কারখানা নমুনার অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং সংগৃহীত ট্যানারী চুক্তিগুলোর চামড়া ও ট্যানারী খাতের এক বড়সংখ্যক চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে বলা যায়। তৈরি পোশাক খাতের ক্ষেত্রে নমুনায়নে একইভাবে আনুপাতিকভাবে নেয়া হয়েছিল এবং নমুনাধীন কারখানাগুলোর ৮৪ শতাংশের বেশি কারখানা ঢাকা বিভাগের। তৈরি পোশাক খাত থেকে সংগৃহীত চুক্তিগুলো ঢাকা বিভাগের বিধায় বলা যায় এগুলোও তৈরি পোশাক খাতের এক বড় সংখ্যককে চুক্তিকে কভার করেছে।

বক্স ৯: যৌথ দরকষাকষি চুক্তি (সিবিএ) – গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশ ইন্ডাস্টিয়ালল ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক ফেডারেশনগুলোর সাথে বিআইডিএস দল ইমইল ও ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস, টেক্সটাইল ও চামড়া শ্রমিক ফেডারেশন (বিজিটিএলডব্লিউএফ), বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স লীগ এবং ট্যানারী শ্রমিক ইউনিয়ন এ তিনটি সংগঠন চুক্তিগুলোর কপি পেতে সাহায্য করেছে। বিজিটিএলডব্লিউএফ এর সভাপতি তৈরি পোশাকখাতের ৬টি চুক্তির কপি বিআইডিএস কার্যালয়ে এসে দিয়ে যান। এ ছয়টির মধ্যে ৫টি স্বতন্ত্র কারখানা বা কোম্পানির সাথে সম্পাদিত হয়েছিল এবং ১টি ঢাকার আশুলিয়া অঞ্চলের সাধারণ শ্রমিকদের অভিযোগ সমাধানের জন্য তৈরি পোশাক শিল্পের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণলয়ের সাথে করা হয়েছিল। বিআইডিএসকে এই ৬টি চুক্তিপত্র স্ক্যান/ফটোকপি করার অনুমতি দেয়া হয়। বিজিটিডিব্লিউএফ এর সভাপতি তাদের কার্যক্রম ও কিছু যৌথ দরকষাকষি চুক্তির পটভূমি ব্যাখ্যা করতে বিআইডিএসকে একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হয়েছিলেন ।

বিটিজিডব্লিউএল তৈরি পোশাক খাতের ১১টি চুক্তির কপি ইমেইলে দুই পর্বে বিআইডিএসে প্রেরণ করে। প্রথম পর্বে ৪টি ও ২য় পর্বে ৫টি বিজিটিএলডব্লিউএফ এর মতো বিজিটিডব্লিউএল এর কাছে চুক্তিগুলোর ডিজিটাল কপি না থাকায় তারা সেগুলো ট্রেড ইউনিয়নগুলো থেকে সংগ্রহ করে ইমেইলে বিআইডিএস-এ প্রেরণ করে। তারা চুক্তিপত্রগুলোর ছবি তুলে পাঠিয়েছিল বিধায় বিআইডিএস-কে সেগুলো আবার টাইপ করাতে হয়।

ট্যানারী শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে ইন্ডাস্ট্রিঅল ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়। তাদের চুক্তিগুলো তিন পর্বে সংগ্রহ করা হয়েছিল, প্রথম দুই পর্বে ইমেইলের মাধ্যমে এবং ৩য় পর্বে বিআইডিএস নিযুক্ত একজন সুপারভাইজার (যিনি মজুরি জরিপের জন্য নিয়োগকৃত) ঢাকায় তাদের ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে চুক্তিগুলোর স্ক্যান কপি সংগ্রহ করেন। ট্যানারী চুক্তিগুলো খুব সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে কারণ তাদের চুক্তিগুলো সম্পূর্ণ, এবং কারখানা ও বিষয়-সুনির্দিষ্ট নয়।

যৌথ দরকষাকষি চুক্তির কোডিং এবং টীকা

বিআইডিএস গবেষণা দল ওয়েজইন্ডিকেটর দলের নির্দেশনাবালী অনুযায়ী ওয়েজইন্ডিকেটরের সিবিএ টুলে (যা কোবরা (সিওবিআরএ) নামে পরিচিত) চুক্তিগুলোর কোডিং এবং এনোটেশনের কাজ সম্পন্ন করে। চুক্তিগুলো বাংলায় লিখিত হওয়ায় প্রথমে সেগুলোকে মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ডে 'ইউনিকোড' ফরম্যাট

ব্যবহার করে টাইপ করা হয় যা সকল অনলাইন প্লাটফর্মে পড়া যায়। ওয়েজইন্ডিকেটর দল এগুলোকে এইচটিএমএল ফরম্যাটে পরিবর্তিত করে টীকা তৈরির জন্য সার্ভারে আপলোড করে।

'কোবরা' তে একটি প্রশ্নমালার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যৌথ দরকষাকষি চুক্তিতে কোনো বিষয় এড্রেস করা হয়েছে কি না তা চিহ্নিত (কোডিং) করা যায়। প্রাসঙ্গিক ধারাগুলো নির্বাচিত করে সেগুলোর টেক্সট টীকা করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরো প্যারা ধরেই টীকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কারণ প্রাসঙ্গিক বাক্যগুলো লম্বা এবং পুরো প্যারা জুড়ে ছিল, এবং প্রায় সময় দেখা গেছে নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর জানা ও বোঝার জন্য পুরো প্যারাই পড়তে হয়।

যৌথ দরকষাকষি চুক্তিগুলো অনলাইনে দেখা যাবে এখানে: https://mywage.org.bd/labour-laws/collective-agreements-database

যৌথ দরকষাকষি চুক্তির বিন্যাস এবং স্বাক্ষরকারী

তৈরি পোশাক খাতের সংগৃহীত চুক্তিগুলোর মধ্যে একটি বাদে (রোমানা ফ্যাশন) সবগুলোই এক থেকে দুই পৃষ্ঠার হয়ে থাকে এবং নির্দিষ্ট কারখানার নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে। সেজন্য এগুলোর কোনোটিতেই নবায়নের তারিখ উল্লেখ থাকে না (রোমানা ফ্যাশন-এর চুক্তিটি বাদে)। চুক্তি স্বাক্ষরকারীর অন্তর্ভুক্ত হলো কারখানা/কোম্পানির প্রতিনিধি, শ্রমিক ফেডারেশন বা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর শ্রমিক প্রতিনিধি এবং কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকরা। সংগৃহীত চুক্তিগুলোর মধ্যে যেগুলোর স্বাক্ষরকারী শ্রমিক সেগুলোতে স্বাক্ষরকারী শ্রমিকের নাম উল্লেখ নেই শুধু স্বাক্ষর আছে।

তৈরি পোশাক খাতের বিপরীতে চামড়া ও ট্যানারীর চুক্তিগুলো আকার ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বড় হয় যা 'কোবরা' টুলে তালিকাভুক্ত অনেক বিধিবিধান অন্তর্ভুক্ত করে। এই চুক্তিগুলো দেশের লেদার অ্যান্ড লেদারগুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিএফএলএলএফইএ) এবং ট্যানারী শ্রমিক ইউনিয়নের মাঝে স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে এবং ২ বছর অন্তর চুক্তি নবায়ন করা হয়। এই চুক্তিগুলোর শুরুতে এবং শেষে স্বাক্ষরকারীদের নাম উল্লেখ থাকে এবং এগুলো ১১ থেকে ১৪ পৃষ্ঠার হয়ে থাকে। উপরে উল্লেখিত তৈরি পোশাক খাতের রোমানা ফ্যাশনের চুক্তিটি একটি সম্পূর্ণ/পূর্ণাঙ্গ চুক্তি সদৃশ এবং প্রতি ২ বছর অন্তর নবায়ন করা হয়, কিন্তু তা ট্যানারী খাতের চুক্তিগুলোর মতো বিস্তারিত ও সর্বাত্বক নয়।

চামড়া খাতে ২০০০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত স্বাক্ষরিত সবগুলো চুক্তি পাওয়া গিয়েছে। এগুলো প্রতি ২ বছর অন্তর নবায়ন করা হয় এবং ১লা জানুয়ারি থেকে কার্যকর করা হয়। এই প্রতিবেদনটি লেখার সময় ট্যানারী যৌথ দরকষাকষি চুক্তি ২০২০ সালের জন্য নবায়ন হয়নি, যদিও ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে এ শিল্প সংগঠনের নিকট ইউনিয়ন কর্তৃক লিখিত চাহিদাপত্র জমা দেয়া হয়েছে (ইউনিয়ন প্রতিনিধির মতে)। চুক্তি নবায়ন হয়ে গেলে সকল চুক্তি ১লা জানুয়ারি ২০২০ থেকেই কার্যকর হবে আগেরগুলোর মতো অর্থাৎ চুক্তি যখনই স্বাক্ষরিত হোক না কেন তা বছরের প্রথম মাস জানুয়ারির ১ তারিখ থেকেই কার্যকর হয়।

সিলেটে চা খাতে একটি মূল ট্রেড ইউনিয়ন রয়েছে (ঢাকায় ট্যানারি ইউনিয়নের মতো), বিধায় চা খাতের যৌথ দরকষাকষি চুক্তিগুলো বিস্তারিত বা সর্বাত্বক হবে বলে আশা করা যায়। কয়েকবার চেষ্টা করেও এই খাতের চুক্তিগুলো পাওয়া যায়নি। যাহোক ভবিষ্যতে সেগুলো পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

যৌথ দরকষাকষি চুক্তির বিষয়সমূহ

তৈরি পোশাক খাতের চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে যদি চুক্তির মাধ্যমে সমাধানকৃত নির্দিষ্ট বিষয়টি মজুরি সংক্রান্ত হয়ে থাকে তবে নির্দিষ্ট তারিখ থেকে সকল বকেয়া প্রদানের জন্য শর্তাবলি অন্তর্ভুক্ত করা আছে। ট্যানারীর সিবিএগুলোতে স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত স্থায়ী কর্মীদের বেতন, স্থায়ী কর্মীদের জন্য মজুরির বিস্তারিত ব্যাখ্যা, অধিকালীন কাজের মজুরি এবং নৈশকালীন কাজের মজুরিসহ প্রতিটি নবায়নে মজুরির বিষয়ে একমত হয়। চুক্তিগুলোতে (তৈরি পোশাক ও ট্যানারী উভয় খাতে) চুক্তি স্বাক্ষরের নির্ধারিত তারিখের পরের তারিখ দেয়া থাকলেও চুক্তি অনুসারে বেতন ও বকেয়া পূর্বের তারিখ থেকে প্রদান করা হয়।

তৈরি পোশাক খাতে চুক্তিগুলো কারখানা এবং বিষয় সুনির্দিষ্ট হওয়াতে সেগুলোতে নিম্নরূপ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:

- সুনির্দিষ্ট কারণে অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পুনরায় নিয়োগ করা,
- ছাঁইকৃত শ্রমিকদের বকেয়া বেতন প্রদান,
- গর্ভবতী নারী শ্রমিকদের পুনরায় নিয়োগ করা,
- কারখানাগুলো পুনরায় খোলা এবং ধর্মঘট/ভাঙচুরের পর শান্তি বজায় রাখা,
- কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধর্মঘট/ভাঙচুরে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের বিরূদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার,
- সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর বিক্ষোভকারী কর্মীদের প্রতি বৈষম্য না করা,
- সম্মত তারিখে সকল বকেয়া অর্থ প্রদান করা ইত্যাদি।

চামড়াও ট্যানারী খাতের চুক্তিগুলোতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকেঃ

- স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি,
- সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত স্থায়ী শ্রমিকদের বার্ষিক বেতন স্কেল,
- স্থায়ী শ্রমিকদের জন্য বাড়িভাড়া ভাতা, যাতায়াত ভাতা ও চিকিৎসা ভাতা সহ মজুরির বিস্তারিত তথ্য,
- নৈশকালীন কাজের ভাতা,
- অধিকালীন অর্থাৎ অতিরিক্ত সময়ের কাজের মজুরি

- কাজের সময় নাস্তার জন্য আর্থিক ভাতা ও খাবার ভাতা,
- চাকরিচ্যুত হলে প্রতিদান, নোটিশ-পে (ছাঁটাইয়ের পূর্বে নোটিশের পরিবর্তে বেতন), এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড,
- বার্ষিক বোনাস এবং ছুটি,
- অস্থায়ী শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ,
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা কমিটি গঠন এবং কর্মক্ষেত্রে আঘাতজনিত চিকিৎসা খরচ প্রদান বা ক্ষতিপূরণ,
- শ্রম আইন অনুসারে নারী শ্রমিকদের সুবিধা প্রদান,
- কর্মঘণ্টা,
- ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য ছুটি
- শিশু শ্রম ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ব্যবহার বন্ধ করা, এবং
- শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে চাঁদা প্রদান।

২০০২-২০০৮ সালের ট্যানারি চুক্তিগুলোতে অস্থায়ী শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধিতে লিঙ্গ বৈষম্য লক্ষ্য করা গেছে (২০০৪ সালের চুক্তিটি বাদে যেখানে অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি বর্ধনের ধারাটিতে স্পষ্টভাবে লিঙ্গ শব্দটির উল্লেখ করা নেই)। ২০০২, ২০০৬ এবং ২০০৮ সালে অস্থায়ী নারী শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় কম পরিমাণে বৃদ্ধি পেত। ২০০২ সালের চুক্তিতে নারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির পরিমাণ উল্লেখ নেই তবে উল্লেখ আছে যে তাদের কাজের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে মজুরি বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ২০১০ সাল থেকে লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল অস্থায়ী শ্রমিকের দৈনিক মজুরি সমান পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

যৌথ শ্রম চুক্তির আওতা

মজুরি ও কর্ম জরিপ ২০২০ এ যৌথ শ্রম চুক্তি বিষয়ে দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়: তারা কোনো চুক্তির আওতায় আছে কিনা এবং চুক্তির আওতায় থাকাটাকে তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে কিনা (চিত্র ৩১ দেখুন)। প্রতি ১০ জন শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৭ জন বলেছে যে তারা চুক্তির আওতা বহির্ভূত। বাকিরা সমসংখ্যায় জানায় যে তারা চুক্তির আওতাভুক্ত, অথবা এই প্রশ্নের উত্তর তাদের জানা নেই। ২০২০ সালে ৪টি খাতে জরিপকৃত সকল শ্রমিকের মধ্যে যৌথ শ্রমচুক্তির আওতায় আছে ১৮ শতাংশ শ্রমিক, এবং স্থায়ী চুক্তিভুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে ৩৪ শতাংশ যৌথ শ্রমচুক্তির আওতাভুক্ত। ইতোমধ্যে কি অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ে ধারণা পেতে আইএলও তার সামাজিক সংলাপ সূচকসমূহ (সোশ্যাল ডায়ালগ ইন্ডিকেটরস)

শীর্ষক সমীক্ষায় প্রাক্কলন করে যে মজুরি উপার্জনকারীদের ৫ শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানের ১.১ শতাংশ যৌথ শ্রমচুক্তির আওতাভুক্ত (হায়টার এবং স্টয়্ভেস্কা, ২০১১)।

প্রতি ১০ জনে প্রায় ৪ জন শ্রমিক যেকোনো চুক্তির আওতাভুক্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেও ৬ জন তা মনে করে না। যেসব শ্রমিক চুক্তির আওতাভুক্ত তাদের বেশির ভাগ চুক্তির আওতাভুক্ত থাকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে। শ্রমিকদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্রসংখ্যক (২ শতাংশ) এ বিষয়ে কোনো মতামত ব্যক্ত করেনি যে সকল শ্রমিক চুক্তির আওতা বহির্ভূত, তাদের চেয়ে যারা চুক্তির আওতাভুক্ত তারা চুক্তির আওতায় থাকাকে তিনগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে।

যৌথ শ্রমচুক্তিতে নারী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি পুরুষ শ্রমিকদের দ্বিগুণ, কিন্তু পুরুষ শ্রমিকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মনে করে যে চুক্তির আওতায় থাকা গুরুত্বপূর্ণ। চা বাগান/এস্টেটের শ্রমিকদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি শ্রমিক চুক্তির আওতায় থাকে সেখানে চামড়া খাতে আছে প্রতি ১০ জনে ২ জন। পক্ষান্তরে তৈরি পোশাকখাতে যেখানে প্রতি ১০ জনে ১ জনেরও কম শ্রমিক চুক্তির আওতাভুক্ত সেখানে নির্মাণখাতে আওতাভুক্তির হার প্রায় শূণ্যের কোঠায়। তবে নির্মাণ খাতের অর্ধেক সংখ্যক শ্রমিক চুক্তির আওতাভুক্ত থাকাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।

চিত্র ৩১: যৌথ শ্রম চুক্তির আওতাভুক্ত এবং একে গুরুত্বপূর্ণ বলে ধারণাপোষণকারী শ্রমিকের শতকরা হার (লিঙ্গ, বয়স, খাত ও নিয়োগ ন চুক্তি ভেদে)

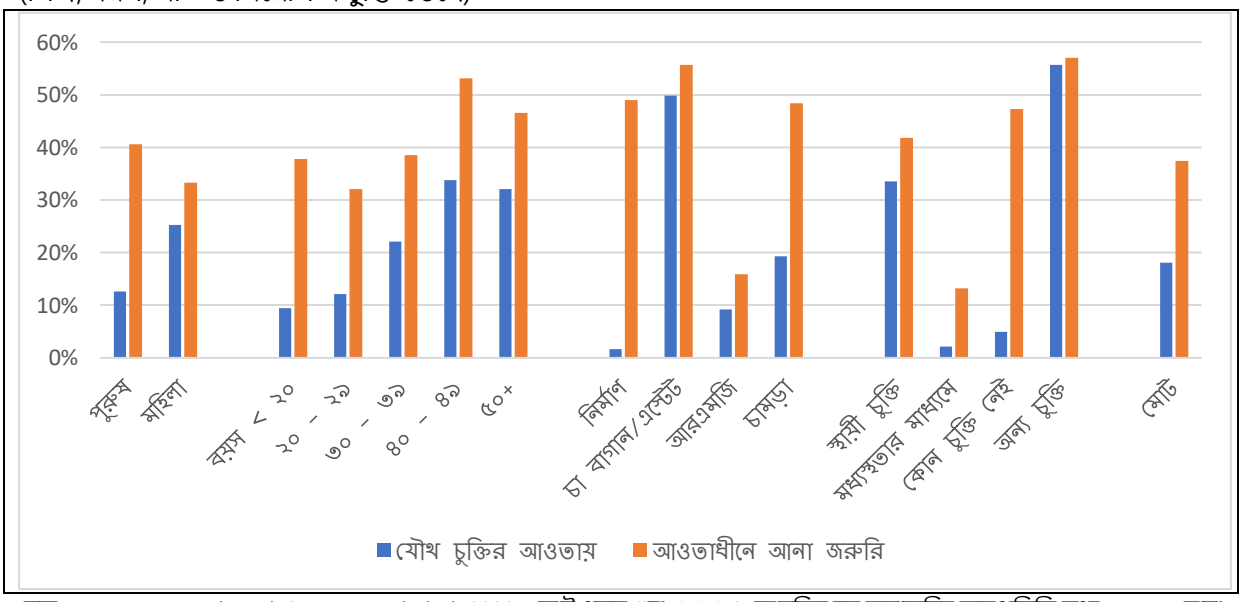

সূত্র: *Wages and Work Survey Bangladesh 2020 (মোট গনসংখ্যা=১, ৮৯৪, আবরিত দর কষাকষির অনুপস্থিতি তথ্য = ৩০৫ (যারা জানেন না তারা সমেত), আবরন গুরুত্বপূর্ণ = ৫৪)*

গ্রন্থপঞ্জি

Ahammed, K.M. (2012) *Investment for Sustainable Development of Bangladesh Tea Industry - An Empirical Study*. Chattagram: Bangladesh Tea Board (BTB)

Ahmed A, Hossain (2016) "*A Study Report on Working Conditions of Tea Plantation Workers in Bangladesh*", Indigenous and Tribal Peoples Project, ILO

Akter A., and Al Mahfuz, M.A. (2018) 'An overview of Bangladesh leather industry'. *Textile Today,* December 17 (https://www.textiletoday.com.bd/overview-bangladesh-leather-industry/)

Anner, M. (2020) *Abandoned? The Impact of Covid-19 on Workers and Businesses at the Bottom of Global Garment Supply Chains. Research Report.* Penn State Center for Global Workers' Rights in Association with the Worker Rights Consortium, April

Bangladesh Institute of Labour Studies (NILS) (2018, 2019) *Workplace Situation Report 2018, 2019*. Dhaka

Bangladesh Institute of Labour Studies-BILS (2015) National Minimum Wage for Bangladesh's Workers: Rational Standard and Rationality of National Minimum. Dhaka, Bangladesh Institute of Labour Studies-BILS

Basak, A. (2018) 'Bangladesh's home textile share is rising in global market'. *Textile Today*, September 22 (https://www.textiletoday.com.bd/bangladeshs-home-textile-share-is-rising-in-global-market/)

BDNEWS24.com (2017) May 1, 'No safety measures for construction workers ' (https://bdnews24.com/bangladesh/2017/05/01/no-safety-measures-for-construction-workers)

Berik, G., and Van der Meulen Rodgers, Y. (2010) Options for Enforcing Labour Standards: Lessons from Bangladesh and Cambodia. *Journal of International* Development 22: 56-85

DTDA (Danish Trade Union Development Agency) (2020) Labour Market Profile Bangladesh 2020. Copenhagen: DTDA, Analytical Unit

Hayter S, Stoevska V (2011) Social Dialogue Indicators. International Statistical Inquiry 2008-09 Technical Brief. Geneva, ILO, Industrial and Employment Relations Department, Department of Statistics

Hossain et al. (2019) "*Impact of Compliance Measures in RMG Industry of Bangladesh*", mimeo, BIDS, Dhaka

Huynh, P. (2017) *Developing Asia's garment and footwear industry: Recent employment and wage trends.* Asia-Pacific Garment and Footwear Sector Research Note. Issue 8, October. Bangkok: ILO Regional Office for Asia and the Pacific

ILO (Ahmed, D., and Hossain, I.) (2016) *A Study Report on Working Conditions of Tea Plantation Workers in Bangladesh.* Dhaka: ILO Country Office for Bangladesh

ILO website (2018) The Rana Plaza Accident and its aftermath (https://www.ilo.org/global/topics/geip/WCMS_614394/lang--en/index.htm), June 13

Khan, M.R.I., and Wichterich, C. (2015) *Safety and Labour Conditions: the Accord and the National Tripartite Plan of Action for the Garment Industry of Bangladesh.* Geneva: ILO/Global Labour University (GLU), Working Paper No. 38

Mamin, D.A., Dey, F., and Das, S.K. (2019) 'Health and safety issues among construction workers in Bangladesh'. *International Journal of Occupational Safety and Health* 9(1): 13-18

McKinsey and Company (2011) *Bangladesh's ready-made garments landscape: The challenge of growth.* W.p.

Mendoza, M. and Alam J. (2017) 'Report examines grim Bangladesh leather trade, links to West', *AP News,* March 25 (https://apnews.com/article/57003bedd3ae4e3e9d1633cf50effc31)

Mirdha, R.U., and Akash, A.R. (2019) 'Leather sector's woes not ending soon'. *The Daily Star,* August 27

Saltmarsh S-J (2019) Key lessons on collective bargaining in Bangladesh's apparel sector. Düsseldorf, Laudes Foundation

Sen et al. (2016), *Labour Market and Skill Gap Analyses in Construction Sector,* Labour Market and Skill Gap in Bangladesh, mimeo, BIDS, Dhaka

SOMO (Centre for Research on Multinational Corporations / CBSG (Capacity Building Support Group) (2015) *Mapping Bangladesh's tanning and leather industries.* Amsterdam

Staritz, C. (2011) 'Chapter 5. Bangladesh's Clothing Exports: From Lowest Costs to Broader Capabilities?', in *Making the Cut? Low-income countries and the global clothing value chain in a post-quota and post-crisis world*. New York: The World Bank, 133-58

The Daily Star (2017) October 12, 'Ensuring construction safety in Bangladesh (Roundtable)' (https://www.thedailystar.net/round-tables/ensuring-construction-safety-bangladesh-1475314)

The Daily Star (2019) December 29, '2019: A good year for construction sector' (https://www.thedailystar.net/star-infrastructure/news/2019-good-year-construction-sector-1846750)

Theuws, M., Van Huijstee, M., Overeem, P., Van Seters, J., and Pauli, T. (2013) *Fatal Fashion. Analysis of Recent Factory Fires in Pakistan and Bangladesh: A Call to Protect and Respect Garment Workers' Lives*. Amsterdam: SOMO / Clean Clothes Campaign

UNCTAD (2020) *World Investment Report 2020. International production beyond the pandemic.* New York

UNCTADstat Database (http://unctadstat.unctad.org/EN/, last accessed November 23, 2020)

Van Klaveren, M. (ed.) (2016) *Wages in Context in the Garment Industry in Asia*. Amsterdam: WageIndicator Foundation

(https://wageindicator.org/documents/publicationslist/publications-2018/2018-garment-wageindicator.pdf)

Van Klaveren, M., and Tijdens, K. (2018) *Mapping the Global Garment Supply Chain*. Amsterdam: WageIndicator Foundation

WageIndicator Foundation and Centre for Labour Research (2020), Labour Right Index 2020. Amsterdam, WageIndicator Foundation

website Bangladesh Tea Board (http://teaboard.gov.bd/ , last accessed November 23, 2020)

website Central Bank of Bangladesh, Commodity-wise export receipts (Comodity wise Export (bb.org.bd), last accessed November 23, 2020)

website ILO, OSH country profile Bangladesh / reform of Bangladesh labour law (https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/country-profiles/asia/bangladesh/lang--en/index.htm ; https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_218067/lang--en/index.htm)

website Research and Markets (https://www.researchandmarkets.com/reports/4855349/bangladesh-construction-and-infrastructure , last accessed November 23, 2020)

website Tea gardens Bangladesh (https://www.mediabangladesh.net/tea-gardens-bangladesh/ , last accessed November 23, 2020)

website wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Leather_industry_in_Bangladesh , last accessed November 23, 2020)